গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২৪-৩০ ডিসেম্বর ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

মেডিকেলে মেধাতালিকার ছাত্রদের প্রতি সরকারি বঞ্চনার বিরুদ্ধে

ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক জয়

সিপিএম ফ্রন্ট সরকারকে ন্যায্য দাবি মেনে নিতে বাধ্য করল পশ্চিমবাংলার ছাত্র আন্দোলন। বহু লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে 'এন আর আই' কোটায় ভর্তি হওয়া ছাত্রদের ভর্তি বাতিল করে জয়েন্ট এন্ট্রান্স উত্তীর্ণ মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের ডাক্তারি পাঠ্যক্রমে ভর্তির সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার। যোগ্যতার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চিত করে, তাদেরই প্রাপ্য সিট 'অনাবাসী' কোটায় (এন আর আই) সংরক্ষিত করে ছাত্র পিছু ৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা দরে যেগুলি বেচে দিয়েছিল সরকার ; ছাত্র সংগঠন ডি এস ও'র যোগ্য নেতৃত্বে ছাত্র-অভিভাবকদের সম্মিলিত আন্দোলন সরকারের সেই ব্যবসাদারী পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিয়েছে, সেই সিটগুলি আবার জয়েন্ট উত্তীর্ণদের কাছেই ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক জয়ে আবারও প্রমাণিত হল, দাবি যদি ন্যায্য হয় এবং সেই দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন যদি যোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত হয় তবে সরকার চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারী হলেও দাবি আদায় সম্ভব।

ছাত্রদের এই জয়লাভের পর কয়েকটি সংবাদপত্র প্রচার করছে যে, অন্যান্য রাজ্যে বিপুল পরিমাণ টাকার বিনিময়ে ডাক্তারি পড়ার যে ব্যবস্থা আছে, সেইরকম ব্যবস্থাই সরকার এ রাজ্যেও করতে চেয়েছিল। কিন্তু সরকার হঠকারী পথে অবিবেচকের মত কাজ করায় এখন তাকে পস্তাতে হচ্ছে। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রমুখ বলে চলেছেন যে, তাঁরা সবই আইন মেনে করেছিলেন, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এখন তাদের কোন কথা শুনতে চাইছে না। কোর্ট 'এন আর আই' ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি খারিজ করেছে এবং তাঁরা তা মানতে বাধ্য।

বস্তুত, এই দু'টি প্রচারের কোনটাই সত্য নয়। প্রথমত, অন্যান্য রাজ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ডাক্তার বানাবার ব্যবস্থা রয়েছে কেবলমাত্র বেসরকারি কলেজগুলিতে, এদেশের কোনও সরকারি কলেজে এর নজির নেই। বঞ্চিত ছাত্রদের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টকে বলা হয়েছে, সরকারি সংস্থায় এন আর আই সংরক্ষণের কোন সাংবিধানিক বা আইনি স্বীকৃতি নেই। কাজেই এই অন্যায় কাজে সিপিএম এদেশে পথপ্রদর্শক বলা যায়। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয়ভাবে কংগ্রেস সরকার প্রথম এদেশে শিক্ষায় বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণের যে স্লোগান তুলেছিল, সিপিএম এ রাজ্যে ব্যাপকহারে ফি-বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে তার কার্যকরী সূচনা ঘটিয়েছে। সরকারি মেডিকেল কলেজ-গুলিতেও তারা বাণিজ্যিকীকরণের পরিকল্পনা নিয়ে পাকা ব্যবসায়ীর মতোই এগিয়েছে সেই ২০০১ সাল থেকে এবং তারই ধারায় তারা সরকারি মেডিকেল কলেজের সিটগুলিকে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বেচবার উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ক্যাপিটেশন ফি নেওয়া যায় না এও তারা জানত, তাই আইনকে ঠেকাতে তারা 'ক্যাপিটেশন ফি' না বলে বলেছিল 'বর্ধিত ফি'। কিন্তু আদালত তা মানেনি। এটা 'ফি' হলে কেবল কোটায় ভর্তি ছাত্রদের ওপর নয়, সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হত। আসলে তাদের চালাকি ভেস্তে গিয়েছে। ফলে 'অবিবেচকের' মতো নয়; জেনেশুনেই তারা পা ফেলেছিল এবং 'হঠকারীপন্থায়' নয়, অত্যন্ত ধূর্ততার সাথেই তারা এপথে এগিয়েছিল। তারা ভেবেছিল, বঞ্চিত ছাত্ররা অসংগঠিত, তাই তারা কিছু করতে পারবে না।

তৃতীয়ত, মুখ্যমন্ত্রী-স্বাস্থ্যমন্ত্রীরা এই প্রশ্নে কোন

ছয়ের পাতায় দেখুন

বন্‌ধ নিয়ে শুনানি

কমরেড প্রভাস ঘোষ নিজেই সওয়াল করতে আদালতে উপস্থিত

এস ইউ সি আই-এর ডাকা ১৭ নভেম্বরের বাংলা বন্‌ধকে বেআইনি ঘোষণা করার জন্য কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দুইজন বিচারপতির ডিভিসন বেঞ্চ এস ইউ সি আইকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে হলফনামা পেশ করার নির্দেশ দেয়, সেইমতো হলফনামা জমা দেওয়া হয়। ১৭ ডিসেম্বর ছিল শুনানির দিন।

এদিন নির্ধারিত সময় সাড়ে তিনটার আগে থেকেই হাইকোর্টের ৩৩নং এজলাসের বাইরে উৎসুক মানুষ জড়ো হতে থাকেন। সাড়ে তিনটার সময় আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলিকে নিয়ে কোর্টরুমে আসেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সাথে ছিলেন কমরেডস্ অসিত ভট্টাচার্য, রণজিৎ ধর, মানিক মুখার্জী, প্রতিভা মুখার্জী, গোপাল কুণ্ডু ও অন্যান্য নেতারা। বহু আইনজীবী ইতিপূর্বেই ওখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, উৎসুক মানুষও ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে যান। ভীড়ে ঠাসা ঘরে স্থান না পাওয়ায় বহু মানুষ ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন।

মামলা উঠতেই বিচারপতি প্রতাপকুমার রায় ও বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের উদ্দেশে আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলি বলেন, এই মামলায় এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক প্রভাস ঘোষ, কোন আইনজীবী ছাড়াই, নিজে সওয়াল করতে চান। বিচারপতি প্রতাপ রায় বলেন, 'ওনাকে তো আমরা ডাকিনি, তবে উনি যখন এসেছেন, তখন ওনার বক্তব্য আমরা শুনব।'' প্রভাস ঘোষের উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, আপনি দীর্ঘদিন রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামেও ছিলেন, সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে আপনি একজন স্তম্ভস্বরূপ। আমরা বুঝতে পারছি, আপনি যা বলতে চান, তা আইনজীবীদের মাধ্যমে বলা সম্ভব নয়। আইনজীবীরা বলবেন আইনের দৃষ্টিতে, আপনার দৃষ্টিকোণ হবে ভিন্ন। আমরা অবশ্যই আপনার কথা শুনব।

এরপর বিচারপতিরা বলেন, সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ জানাবে। ধর্মঘট

সাতের পাতায় দেখুন

বাঙ্গালোরে এ আই ডি ওয়াই ও'র ডাকে বিশাল সমাবেশ

ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন ট্রেনিদের জন্য ৬ মাসের বাধ্যতামূলক ইনটার্নশিপ ব্যবস্থা বাতিল ও প্রাথমিক স্কুলগুলিতে হাজার হাজার শিক্ষকের শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে ৯ ডিসেম্বর কর্ণাটক ডি ওয়াই ও'র আহ্বানে বাঙ্গালোরে বিশাল সমাবেশের একাংশ

কৃষক ও খেতমজুরদের আইনঅমান্য

১৪ ডিসেম্বর পশ্চিমবাংলার জেলাগুলি থেকে হাজার হাজার কৃষক ও খেতমজুর এসেছিল কলকাতায় তাদের অসহনীয় দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের বার্তাকে রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদের জানাতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের কৃষিপুঁজিপতি ঘেঁষা নীতি, জনস্বার্থবিরোধী কর, দর, খাজনা, কৃষিনীতি, মূল্যবৃদ্ধির নীতির ফলে রাজ্যের কৃষকরা জমি হারিয়ে খেতমজুরে পরিণত হচ্ছে। গত ১০ বছরে কৃষকের সংখ্যা কমেছে ৮ লক্ষ, তাদের হাত থেকে ৪৭ লক্ষ ৬৩ হাজার বিঘা জমি চলে গেছে। এই সময়ে খেতমজুরের সংখ্যা বেড়েছে ১৮ লক্ষ ৬৯ হাজার। খেতমজুররা ১৯৮১ সালে বছরে গড়ে কাজ পেত ১২৩ দিন, ২০০৩ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে গড়ে ৭২ দিন। রাজ্যে ২ কোটি ২০ লক্ষ কৃষিমজুরের জীবনে অর্ধাহার, অনাহার নিত্যসঙ্গী। বছরে ১০০ দিন কাজ দেওয়ার কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করার গরজ নেই কেন্দ্রের বা রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের।

সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে গণআইনঅমান্য করে রাজ্য সরকারের কাছে তাদের দাবিগুলি তুলে ধরতে এসেছে বর্ধমান জেলার কৃষকরা। গত বছর আলুর দাম না পেয়ে ঋণভারে আত্মহত্যা করেছেন মেমারির রবীন্দ্র নাথ ঘোষ, জামালপুরের সেখ সৈফুদ্দিন। এ বছরও আলু এবং ধানের ফলন ভাল। আলুর সারের আকাল, এ বছর চাষের খরচও অনেক বেড়েছে, উদ্বিগ্ন চাষীরা চায় ফসলের ন্যায্য দাম। করলার দাম না পেয়ে দিনহাটার রামেশ্বর বর্মন আত্মহত্যা করেছেন, চন্দ্রকোনার বীরভানপুরের শিবহরি চৌধুরীও আলুর দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করেছিল, উত্তরবঙ্গের টমাটো চাষী, লঙ্কা চাষী আত্মহত্যা করেছেন। এবছরও পাইকারদের কাছে সবজির দাম দ্রুত কমে যাচ্ছে, চাষী দাম পাচ্ছে না। তাই উদ্বিগ্ন চাষীরা এসেছে সুদূর কুচবিহার, জলপাইগুড়ি থেকে। নদীভাঙনে সবহারা মুর্শিদাবাদের চাষী ও খেতমজুররা এসেছে বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধের দাবি নিয়ে। এসেছে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার শত শত কৃষক ও খেতমজুর। মেদিনীপুরের পানচাষী, ফুলচাষী, ধানচাষীরাও এই আন্দোলনে এসেছে, এসেছে খরাপীড়িত পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার চাষী ও খেতমজুর। কলেজ স্কোয়ার থেকে বেলা ২টায় মিছিল শুরুর আগে কৃষক ও খেতমজুর জমায়েতে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড খোদাবক্স ও সংগঠনের রাজ্য সংগঠক কমরেড শঙ্কর ঘোষ। তাঁরা বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সিপিএম ফ্রন্ট সরকার কাজ ও উপযুক্ত মজুরি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করেনি। কৃষকদের উপর পঞ্চায়েত কর, বাণিজ্যিক হারে খাজনা চাপিয়েছে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন জেলায় আমাদের সংগঠনের নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলনের চাপে বাণিজ্যিক হারে কর আদায় স্থগিত রয়েছে, পঞ্চায়েত কর চালু করতে পারেনি। গ্রামীণ গরীবদের বছরে ১০০ দিনের কাজের প্রতিশ্রুতি পূরণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গড়িমসি করছে। আজকের আইনঅমান্য আন্দোলনের পরে জেলায় জেলায় ব্লকে ব্লকে গণআইনঅমান্য আন্দোলন পরিচালিত হবে।

দাবি ব্যানার, ফেস্টুনে সুসজ্জিত বিশাল মিছিল শত সহস্র কণ্ঠে স্লোগান দিতে দিতে রানি রাসমণি রোডে পৌঁছালে বিশাল পুলিশবাহিনী মিছিলের গতিরোধ করে দাঁড়ায়। পুলিশের কর্ডন ভেঙে স্রোতের বেগে কৃষক ও খেতমজুররা আইনঅমান্য করে।

দুর্গ সায়েন্স কলেজে পরীক্ষার ফি দ্বিগুণ করার প্রতিবাদে

এ আই ডি এস ও'র প্রতিবাদ মিছিল ও ছাত্র ধর্মঘট

ছত্তিশগড় রাজ্যের দুর্গ শহরে সরকারি সায়েন্স কলেজকে এ বছর "অটোনোমাস কলেজে" পরিবর্তিত করা হয়। সেই সঙ্গে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যাপক ফি বৃদ্ধিও শুরু হয়েছে। গত বছর যেখানে সরকারি কলেজে স্নাতক স্তরে পরীক্ষার ফি ছিল ২৪০ টাকা, এবছর কলেজটি অটোনোমাস হওয়ার পর তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৬৫ টাকা। কলেজের বিভিন্ন বিভাগকে 'সেল্ফ ফিনান্সিং' করা হচ্ছে এবং সেসব বিভাগে ভর্তি হতে আগে যেখানে মোট ৮০০ টাকা লাগত, এখন 'সেল্ফ ফিনান্সিং' হওয়ার পর লাগছে ৪,০০০ থেকে ২৫,০০০ টাকা। ঐ রাজ্যে একমাত্র এ আই ডি এস ও-ই অটোনোমাস কলেজ ও সেল্ফ ফিনান্সিং কোর্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে।

গত ৮ই ডিসেম্বর ২০০৪, দুর্গ সায়েন্স কলেজের সহস্রাধিক ছাত্র পরীক্ষা ফি ও ভর্তি ফি বৃদ্ধি, অটোনোমাস কলেজ ও সেল্ফ ফিনান্সিং কোর্সের বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে মিছিল করে প্রিন্সিপালকে ডেপুটেশন দেয়। প্রিন্সিপাল এ আই ডি এস ও'র প্রতিনিধিদলকে জানান, অটোনোমাস কলেজে ফি সরকার নির্ধারণ করে দেয়, ফলে প্রিন্সিপালের কিছু করণীয় নেই। এ আই ডি এস ও এরপর ঐদিনই জেলার কালেকটরের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন দেয়। প্রশাসন সাড়া না দেওয়ায় ১৬ই ডিসেম্বর দুর্গ সায়েন্স কলেজে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। কলেজের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী গভীর আবেগে ধর্মঘটকে সর্বাত্মকভাবে সফল করে। সরকার দাবি না মানলে গণস্বাক্ষর নিয়ে মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন ও ছাত্র-অভিভাবক ফোরাম গঠন করে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে ঐ রাজ্যের এ আই ডি এস ও'র ইনচার্জ কমরেড বিশ্বজিৎ হাড়োরে এবং এ আই ডি এস ও'র কলেজ কমিটির সভাপতি কমরেড আত্মারাম সাহু জানান।

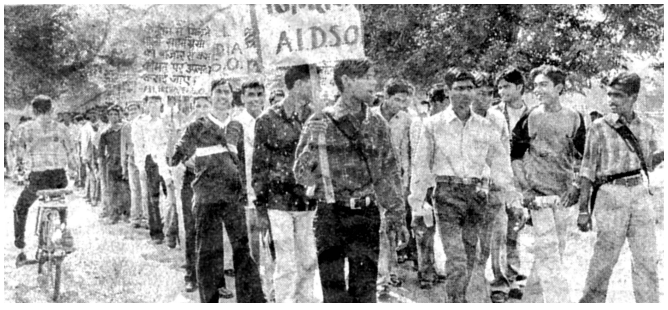

চা-বাগান ঃ রাজ্য সরকার হলফনামা লঙঘন করল

বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের অনাহারের পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া হলফনামা রাজ্য সরকার লঙঘন করল। মালিকপক্ষ গত বছর উত্তরবঙ্গের ২০/২৫টি চা-বাগান বন্ধ করে দিলে বাগানের কয়েক লক্ষ শ্রমিক আচমকা অনাহারের সামনে পড়েন। ডুয়ার্সের মুজনাই, রামঝোরা, চামুর্চি, কাঁঠালগুড়ি, ঢেকলাপাড়া প্রভৃতি চা-বাগানে এক হাজারেরও বেশি শ্রমিক অনাহারে-অপুষ্টিতে বিনা চিকিৎসায় ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যান। সেই সময় এস ইউ সি আই এবং চা-শ্রমিকদের সংগঠন 'নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন' (এন বি টি পি ই ইউ) বন্ধ চা-বাগান খোলার দাবিতে এবং শ্রমিকদের অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে জরুরিকালীন কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে লাগাতার আন্দোলনের সূচনা করে। আন্দোলনের চাপে জলপাইগুড়ি জেলাশাসক রাজ্য সরকারের কাছে পরিস্থিতির মোকাবিলায় একগুচ্ছ প্রস্তাব পেশ করেন। এদিকে খাদ্য ও কাজের অধিকারের দাবিতে অন্য এক সংস্থা থেকে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়। সুপ্রিম কোর্ট অনুরাধা তলোয়ারের নেতৃত্বে এক কমিশন পাঠায় পরিস্থিতি সরেজমিনে তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য।

অনুরাধা তলোয়ার কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে সুপ্রিম কোর্ট পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার কী ব্যবস্থা নিচ্ছে তা হলফনামা করে জানাতে বলে। সেই মোতাবেক রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টকে যা জানিয়েছিল, সম্প্রতি অনুরাধা তলোয়ার মন্তব্য করেছেন, রাজ্য সরকার তা পালন করেনি। রাজ্য সরকার জানিয়েছিল, অন্ত্যোদয় অন্নযোজনা, আই সি ডি এস, ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনশন স্কীম, বেকারভাতা প্রদান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হবে।

সম্প্রতি অনুরাধা তলোয়ার তাঁর সমীক্ষা রিপোর্টে বলেছেন, শ্রমিকরা অন্ত্যোদয় অন্নযোজনার কার্ড পেলেও প্রতি মাসে নিয়মিত খাদ্যশস্য পাননি। বহু চা-বাগানের শ্রমিকরা বেকার ভাতার টাকা পাননি। দেখা যাচ্ছে, রাজ্য সরকার নিজেই হলফনামা লঙঘন করেছে। এবার সুপ্রিম কোর্ট কী ব্যবস্থা নেবে? সংবিধানে বেঁচে থাকার অধিকারের কথা লেখা থাকলেও বাস্তবে গরিব মানুষ খাদ্যাভাবে মরছে। সুপ্রিম কোর্ট অনাহারের পরিস্থিতি মোকাবিলার নির্দেশ দিলেও গরিবরা অনাহারে অর্ধাহারে অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছে। সংবিধান বা কোর্টের নির্দেশিকা ফাইলবন্দী হয়েই থাকছে। গণআন্দোলনের প্রবল চাপ সৃষ্টি করে দাবি আদায় না করতে পারলে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় ন্যূনতম যে অধিকারগুলি ঘোষিত হয়েছে, সেগুলি যে জনগণ পেতে পারে না — এই ঘটনা সেটাই দেখিয়ে দিল।

বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ত্রিপুরায় আন্দোলন

ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিকে অজুহাত করে ত্রিপুরার সিপিএম ফ্রন্ট সরকার ১ ডিসেম্বর থেকে ১০ শতাংশ বর্ধিত বাসভাড়া চালু করে দেয়। ত্রিপুরার মতো অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা রাজ্যে যেখানে বেশিরভাগ মানুষের নির্দিষ্ট কোন আয় নেই, এই ভাড়াবৃদ্ধি তাদের দুর্দশাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। এস ইউ সি আই ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি এই ভাড়াবৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ করে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।

১০ ডিসেম্বর বিধানসভার সামনে দলের পক্ষ থেকে কয়েকশত মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বাসভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

আইন ও ন্যায়ের দ্বন্দ্বে ন্যায়ের পক্ষেই দাঁড়াতে হবে

নাগরিক কনভেনশনের ঘোষণা

বেশ কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে , এরাজ্য সহ গোটা দেশ জুড়েই গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও অধিকারের উপর ক্রমাগত আইনি হস্তক্ষেপ ঘটছে। মুমূর্ষু পুঁজিবাদের চূড়ান্ত আক্রমণে জনজীবন যখন বিপর্যস্ত, তখন এই আক্রমণ প্রতিরোধে দেশের মানুষ যাতে কোন কার্যকরী আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে, তার জন্যই এই পরিকল্পিত হস্তক্ষেপ। এই ঘটনা কার্যত গণতান্ত্রিক অধিকারকে সংকুচিত করে প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্রের পথকে সুগম করবে, যা শেষপর্যন্ত দেশকে ফ্যাসিবাদের দিকে নিয়ে যাবে।

এমতাবস্থায় স্থির থাকতে পারেননি রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। ১৩ ডিসেম্বর কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে 'কমিটি ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইট্স অ্যাণ্ড সেকুলারিজম' কর্তৃক আহূত এক নাগরিক কনভেনশনে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট মানুষ। নানান দিক থেকে বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা। সকলের বক্তব্য থেকেই যে মূল কথাটি বেরিয়ে এসেছে তা হচ্ছে, আইন এবং ন্যায়ের দ্বন্দ্বে সর্বদাই ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মানুষের জন্মগত অধিকার। যতদিন সমাজে অবিচার-অত্যাচার-নির্যাতন-শোষণ-পীড়ন থাকবে, ততদিন আন্দোলনের নানা 'ফর্ম' হিসাবে বন্‌ধ-ধর্মঘট-হরতালও থাকবে। এ অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারেনা। তাঁরা সকলেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করেন। বয়সের ভারকে উপেক্ষা করে কনভেনশনে উপস্থিত হয়েছিলেন নব্বই-উর্ধ্ব বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, অশীতিপর আইনজীবী বিশ্বনাথ বাজপেয়ী, কবি ও সাহিত্যিক তরুণ সান্যাল, বিচারপতি অবনীমোহন সিনহা, বিশিষ্ট জননেতা মানিক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত।

প্রবীণ আইনজীবী পৃথ্বীশ বাগচী বলেন, 'রুল অফ ল' এবং 'সোশ্যাল জাস্টিস' এক জিনিস নয়। তিনি বলেন, হাইকোর্ট বা আইন যাই বলুক, কোনও স্বাধীনচেতা মানুষ যদি নৈতিকভাবে মনে করেন, সেই আইন না মানা উচিত, তবে তিনি মানবেন না — এতে হাইকোর্টের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, আমি যদি মনে করি মানুষের দাবি আদায় করবার জন্য একটা সাধারণ ধর্মঘট অনিবার্য, তাহলে সেটা বেআইনি হোক, আমার ছ'বছর সাজা হোক, তার ভয়ে আমি আন্দোলন থেকে বিরত থাকব না। তিনি বলেন, যেখানে সামাজিক প্রয়োজন, অর্থনৈতিক প্রয়োজন, সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজন, সেখানে আইনের রক্তচক্ষু আমাকে আবদ্ধ রাখতে পারবে না। এটি আমার সামাজিক কর্তব্য। এই কর্তব্যেই মহাত্মা গান্ধীর সিভিল ডিস-ওবিডিয়েন্স, এই কর্তব্যেই সুভাষচন্দ্রের আইনঅমান্য আন্দোলন। তিনি বলেন, সরকার দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে পারছে না। ফলে শ্রমজীবী মানুষ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, অর্থবান লোক আরও অর্থশালী হচ্ছে। আজ পর্যন্ত কোনও কোর্ট কি বলতে পেরেছে, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এর বেশি হলে সরকার ভর্তুকি দেবে ? যতক্ষণ মানুষের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা না হচ্ছে, সব মানুষের কাজের ব্যবস্থা না হচ্ছে, মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা না হচ্ছে, দরিদ্র এবং ধনীর মধ্যে বিভেদ দুস্তর হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ সংবিধানের ঢং করে কোনও বিচার করলে সেটা আর যাই হোক, মাটি-ছোঁয়া বিচার হবে না। আন্দোলন, ধর্মঘট আমার বেঁচে থাকার অধিকারের সঙ্গে যুক্ত। একে সংবিধানের ঢং-এ বিচার করলে চলবে না।

বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক অধ্যাপক তরুণ সান্যাল বন্‌ধের নিষেধাজ্ঞা মানা না-মানার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, যখন প্লেটোর 'রিপাবলিক' পড়েছিলাম, তাতে বলা ছিল, ভাল মানুষ আর ভাল নাগরিকের মধ্যে তফাৎ আছে। ভাল নাগরিক, রাষ্ট্র যেমনভাবে নির্দেশ করে, সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তা পালন করে। আর ভাল মানুষ বহু সময়ই তা পালন করেনা। তিনি বলেন, রাষ্ট্র আদতে শ্রেণীশক্তির শাসন এবং শোষণ করবার যন্ত্র। যখন শাসকশ্রেণী অসম্ভব সংকটের ভেতরে পড়ে, তখন সেই সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সে কখনো শাসন বিভাগের সহায়তা নেয়, কখনো আইনসভার সহায়তা নেয়। এসব কিছু ব্যর্থ হলে, শেষপর্যন্ত সে বিচারবিভাগের সহায়তা নেয়।

এখন যেদেশের শাসনবিভাগের বিশ্বাসযোগ্যতা ভেঙে গেছে, আইনসভাগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা ভেঙে গেছে, সেখানে সেই দেশের শাসকশ্রেণীকে সংকট থেকে বাঁচাতে বিচারবিভাগ শেষপর্যন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করছে। তা যেন বলতে চাইছে, গণআন্দোলন করে যদি কেউ একটি বিকল্প প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে চায়, তবে তারা যাতে তেমন কোনও কাজ করতে না পারে, তার জন্য পুরনো কাঠামোর যেসমস্ত লোকেরা রয়েছে, তারা চেষ্টা করবে। এ যদি চলতে থাকে, তাহলে আমরা শেষপর্যন্ত ঐ হিটলারের মতো ফ্যাসিবাদে পৌঁছে যাব।

তিনি দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, যাঁদের সামনে রেখে দেশে ধর্মের নাচানাচি চলছে, সেই তাঁদেরই একজন কাঞ্চির শঙ্করাচার্য এখন জেলে। যে রাজনৈতিক নেতারা লোকসভায় দাঁড়িয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছুঁড়ছেন, যাঁরা কোটি কোটি টাকার দুর্নীতিতে জড়িত তাঁরাই মন্ত্রীত্ব করছেন। আইনসভাগুলি আজ একটা নোংরা জায়গায় পরিণত হয়েছে। নামকরা বিচারপতি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে যোগসাজশে গৃহ তৈরি করার জন্য চমৎকার একটি জমি পেয়ে যান। যখন দেশের কলকারখানা উঠে গিয়ে সেসব জায়গায় বড় বড় বাড়ি হচ্ছে, চা-বাগানগুলি তুলে দিয়ে আবাসন তৈরি হচ্ছে, চাষীদের উৎখাত করে নতুন শহর পত্তন হচ্ছে, তখন কোনও হাইকোর্ট, কোনও বিচারপতি তার প্রতিবাদ করেনা।

১৭ তারিখে যাঁরা বন্‌ধ ডেকেছিলেন, তাঁরা যখন বললেন, ডিজেল-পেট্রোল-রান্নার গ্যাসের দামবৃদ্ধি হয়েছে, এর প্রতিবাদ করা দরকার, তখন সংবাদপত্রগুলি বলতে লাগল, এটা কী ভীষণ অন্যায় হচ্ছে। আর আমাদের দেশের তথাকথিত ক্ষমতাসীন বামপন্থী দলগুলি 'হ্যাঁ হ্যাঁ, না না' করতে শুরু করল। ক্ষমতা ভারি অদ্ভুত জিনিস। একদিন যে বামপন্থীদের রাজনীতিতে পরম সতী বলে মনে হ'ত, তারা সকলেই ক্ষমতার মন্দোদরী হয়ে গেলেন। তা, বন্‌ধের ফলে যে চাপটা তৈরি হল, তার ফলটা কী হল ? কেন্দ্রীয় সরকার কথাবার্তা শুরু করে দিল যে, গ্যাসের দাম যে মাসে মাসে পাঁচ টাকা হিসাবে বাড়ানোর কথা ছিল, তা আর বাড়বে না। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত আপনজন আছে, তারা চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে খবর নিল যে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ এবং তারা আন্দোলনে নেমেছে, ভয় দেখিয়ে তাদের আর আটকানো যাবে না।

তিনি বলেন, বিচারক থেকে শুরু করে সকল মানুষেরই ব্যক্তিগতভাবে, সমাজগতভাবে, শ্রেণীগতভাবে ভূমিকা থাকে নিজের অবস্থান থেকে গোটা সমাজটাকে দেখার। হাইকোর্টের বিচারপতিও তো সেইভাবে দেখবেন। তাঁর তো এখানে ভুল হওয়ার কারণ নেই। তিনি অত্যন্ত জোরের সাথে বলেন, আমরাও বন্‌ধ করে ঠিক করেছি। আমরা বন্‌ধ করব, আমরা ধর্মঘট করব, প্রতিবাদ করব, যে মানুষ প্রতিবাদ করতে পারেনা, তার মনুষ্যত্ব অর্জনের কোনও অধিকার থাকে না।

প্রবীণ আইনজীবী বিশ্বনাথ বাজপেয়ী বলেন, ছাত্রাবস্থা থেকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই আমরা শিখেছি, অন্যায়কে বরদাস্ত করতে শিখিনি। আমাদের সংবিধান কী বলছে সে কূট তর্কের মধ্যে যদি ঢোকেন, তবে নানারকমের কথা আসবে। অথচ সংবিধান কি কোনও জায়গায় বলেছে, আমি যদি না খেতে পাই, সরকার আমাকে খাওয়াবে ? কোটি কোটি ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখে চাকরি পাচ্ছে না — এই সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। কোনও জায়গায় সংবিধানে কি বলা আছে যে, তাদের চাকরি দিতেই হবে, সরকারের কর্তব্য এদের চাকরি দেওয়া ? সে কথার উল্লেখ কোনও জায়গায় নেই। সুতরাং আইনের কচকচির মধ্যে আমরা যদি ঢুকি, আমাদের যে নিজস্ব অধিকার, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার অধিকার তা আমরা হারাব। ধর্মঘট আমরা কখন করি? যখন আমাদের দাবি আর অন্য কোনও উপায়ে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তখন বাধ্য হয়ে আমরা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই, ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়াই; হাত উঁচু করে চিৎকার করে বলি, আমরা তোমাকে মানিনা, তোমার এই ব্যবস্থা আমরা মানিনা। অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ করার অধিকার আমাদের আছে, সেজন্য যদি ধর্মঘট করতে হয়, একশোবার আমরা তা করব। যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে লড়ছে, পুলিশের লাঠি খাচ্ছে, যে মেয়েরা পুলিশের দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছে, সে তো দরিদ্র মানুষের বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, আইনের কূট তর্ক শোনার জন্য নয়। যাঁরা লড়াই করছেন, আমি এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের বলছি, আইনের কচকচি আপনারা শুনবেন না, আপনারা লড়াই চালিয়ে যান।

কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার তুষার তালুকদার বলেন, আমি সারাজীবন সরকারি চাকরি করেছি। যে বিভাগে কাজ করেছি, তার উপর ভার ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার। কাজেই হরতাল, ধর্মঘট, পরবর্তীকালে বন্‌ধ ইত্যাদি বিভিন্ন রূপের আন্দোলনকে, আমি বা আমার মতো যাঁরা, তাঁরা আর একটা দিক থেকে বরাবর দেখে এসেছি।

(বাঁদিক থেকে) পার্থসারথি সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ বাজপেয়ী, তুষার তালুকদার, গৌতম সেন, সুশীল মুখোপাধ্যায়, মানিক মুখোপাধ্যায়, মুবারক করিম জোহর, তরুণ সান্যাল ও গীতেশ শর্মা। ছবিতে নেই পৃথ্বীশ বাগচি, অবনীমোহন সিনহা ও তপন রায়চৌধুরী।

চারের পাতায় দেখুন

নাগরিক কনভেনশনের ঘোষণা

তিনের পাতার পর

যারা করবে সেই রাজনৈতিক দলকেই শুধু শাস্তি দেওয়া নয়, ধীরে ধীরে এমন অবস্থা তৈরি করা হবে যাতে হরতাল, বন্ধ, ধর্মঘট ইত্যাদি লোপ পায়। এই সমস্ত অধিকার বহুদিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের একমাত্র আশা ভরসা যে, এই ধরনের নানা রূপের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একদিন হয়তো তাদের ন্যূনতম দাবিগুলো প্রতিষ্ঠা করা যাবে, যা দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে এখনও হয়নি। এখন যদি এই আন্দোলনের রূপগুলো চলে যায়, তাহলে তো জনগণের ন্যূনতম দাবিগুলিরই আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না। সত্যি কথা বলতে কী, বর্তমান পৃথিবীর দিকে তাকালে, এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের অবস্থা লক্ষ্য করলে খুব আশঙ্কা হয়। আপনারা জানেন, এখন এক ধরনের ইউনিপোলার ইউনিভার্স বা একমেরু বিশ্বের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ একটি স্বার্থ, একটি শক্তি, একটি শ্রেণী, তারাই সব ব্যাপারে প্রাধান্য পাবে। আসলে গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের সঙ্গে অল্পসংখ্যক মানুষের স্বার্থের যে বিরোধ, তা আজও চলছে। দুঃখের বিষয়, এই অল্পসংখ্যক মানুষই রাষ্ট্রক্ষমতাকে, বিচারব্যবস্থাকে, প্রশাসনকে সম্পূর্ণভাবে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে, এখনও পারে। সাধারণ মানুষের আজ অপরিসীম দুঃসময়ের অপর একটি কারণও আপনারা জানেন। তা হল, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়। এটাই ধনিকশ্রেণীকে সুযোগ করে দিল তাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার। কাজেই কোর্টের যে রায়, তা এই অবস্থারই প্রতিফলন মাত্র। যতদিন শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল, ততদিন এতখানি প্রকাশ্যে বা এত হেঁকেডেকে বলা যেত না — যেমন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'বন্ধ তো একটা ব্যাধি'। এরপর শোনা যাবে, যেকোন আন্দোলনও একটা ব্যাধি। আসলে বিশ্বায়নের জন্য যা যা করা দরকার, সরকার তাই করছে। যদিও আমাদের জানা আছে, বিশ্বায়নের ফলে যত না সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শ্রমিকশ্রেণী। ইনফরমেশন টেকনোলজি নিয়ে এত হৈচৈ করা হচ্ছে, অথচ গোটা দেশে কর্মে নিযুক্ত মানুষের এক শতাংশও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজ করেনা।

তিনি বলেন, বন্ধ বিরোধী যেসব কথাবার্তা এখন আসছে, তার আসল উদ্দেশ্য হল, গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের মধ্যে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের দাবিদাওয়া যাঁরা তুলে ধরতে চান, আস্তে আস্তে তাঁদের কণ্ঠরোধ করা। ফলে আজকের এই কনভেনশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হয়ে আমিও বলতে চাই, এই অধিকারগুলো যদি চলে যায়, তাহলে এক ভয়াবহ সময়ের উদ্ভবকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। সাধারণ মানুষের বাঁচবার অধিকার, বাঁচবার জন্য প্রতিবাদ করবার অধিকার — এই সবগুলোকেই বিশ্বায়নের নামে শিল্পপতিদের স্বার্থে হরণ করে নতুন তন্ত্র রচনার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা যে যেখানে আছি, সেখানে থেকেই প্রতিবাদ আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করা আজ জরুরি।

বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত বলেন, কিছুকাল আগে দেখেছি, হাইকোর্ট মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল, সম্প্রতি বন্ধকেও নিষিদ্ধ বলে রায় দেওয়া হল। এগুলোকেই আইনি হস্তক্ষেপ বলা হচ্ছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতেই আপনারা নাগরিকদের ইতিকর্তব্য স্থির করতে এই নাগরিক কনভেনশন ডেকেছেন। আইনের ছাত্র হিসাবে আমি জানি, আইনের কাজ মানুষের অধিকার রক্ষা করা, আজ সেই আইনের বিরুদ্ধে যদি হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠে, তবে বিচারকদের সেটা বারবার ভেবে দেখা দরকার। বিচারপতিরা অভ্রান্ত নন। আজ আইনের যা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, আগামীকাল তা নাও বলা হতে পারে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিচারপতিরা তাঁদের মত পরিবর্তন করেন। সেজন্য সামাজিক উচ্চকিত চিন্তার প্রয়োজন আছে। সংগ্রামী সমাজের যেটা বক্তব্য সেটা বিচারপতিদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এজন্য আদালতে গিয়ে যুক্তিগুলো তাঁদের সামনে রাখতে হবে। অন্যদিকে, সামাজিকভাবেও প্রচার তুলতে হবে, যাতে সমাজের চিন্তার প্রতিফলনও বিচারপতিদের কাছে পৌঁছায়।

তিনি বলেন, বন্ধ নিয়ে যে রায় দেওয়া হয়েছে, তা আইনের ছাত্র হিসাবে আমার মধ্যে কিছু প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বারবার বলেছে, 'No person should be punished unheard', অর্থাৎ কোন ব্যক্তির বক্তব্য না শুনে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। অথচ ১৭ নভেম্বরের বন্ধের বিরুদ্ধে যে রায় দেওয়া হয়েছে, তাতে সরকারের প্রতি অন্যান্য নির্দেশের সাথে এটাও রয়েছে যে, বন্ধের দিন যে সমস্ত সরকারি কর্মচারি আসবেন না, তাঁদের মাইনে কেটে নিতে হবে। আইনের ছাত্র হিসেবে আমার প্রশ্ন, কোনও সরকারি কর্মচারী বা তাদের সংগঠনের কেউ কি বিচারপতিদের সামনে উপস্থিত ছিলেন? না। ছিলেন আবেদনকারী ও সরকার, অর্থাৎ সরকারি কর্মচারীদের 'এমপ্লয়ার'। অধিকার খর্ব হল কার ? সরকারি কর্মচারীর। অথচ তার কথাই শোনা হল না। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, সরকারি কর্মচারী যদি বন্ধে সামিল হতে চায়, যেটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার — সেটা সে পারবে না। সামিল হলে তার বেতন কেটে নেওয়া হবে। কোর্ট এই রায় দিয়েছে। কারণ, কোর্টের মতে, বন্ধে জবরদস্তি অন্যকে বাধা দেওয়া হয়, যাতে সে কাজে যোগ দিতে না পারে, এটা অন্যায়, ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। কিন্তু আইন যখন কাউকে জোর করছে যে, না চাইলেও তাকে কাজে আসতে হবে — সেটা কি ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নয়? তাহলে আইনি হস্তক্ষেপে স্ববিরোধ দেখা যাচ্ছে। আইনে কিন্তু এর জায়গা নেই। আইন যদি বলে, বন্ধ করে কাউকে যাতায়াতে বাধা দেওয়া যাবে না, একইভাবে তাকে বলতে হবে, কেউ যদি স্বেচ্ছায় বন্ধ করতে চায়, তবে তার পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার সেখানে রইল। কই, বিচারপতিরা তো এটা বললেন না! এখানেই গণতান্ত্রিক অধিকারে আইনি হস্তক্ষেপ ঘটে গেল। সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকারে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকারে আইনি হস্তক্ষেপ ঘটল। বিচারপতিদের ভাবতে হবে, যার সাজার বিধান দিলাম, যাদের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করলাম, তাকে শোনার দায় পর্যন্ত নেই ?

আদালত বলেছে, সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে বন্ধ অসাংবিধানিক। কেরালা হাইকোর্ট একটি রায় দিয়েছিল, যার বিরুদ্ধে মামলা সুপ্রিম কোর্টে যায়। সেখানেই সুপ্রিম কোর্ট একথা বলেছে। কেরালা হাইকোর্টে কারা গিয়েছিল জানেন? সাধারণ মানুষ বন্ধের প্রতিবাদ করতে যায়নি। পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি, মালিকশ্রেণীর প্রতিনিধি চেম্বার অফ কমার্স গিয়ে বলেছিল, আমাদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে! এই পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাকাডেমিক আলোচনায় কেরালা হাইকোর্ট বলেছিল, আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, বন্ধের দিনে গাড়ি-ঘোড়া পোড়ে, সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি হয়, সুতরাং বন্ধ মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ। তবে হরতাল বা ধর্মঘট অসাংবিধানিক নয়। ছাত্রজীবনে শেক্সপীয়ার পড়েছিলাম, 'হোয়াট'স ইন এ নেম?' — অর্থাৎ, নামে কী আসে যায়। কিন্তু আজ আইনের ছাত্র হিসাবে দেখছি, নামটাই সর্বস্ব। গণতান্ত্রিক অধিকার নামের ওপর নির্ভরশীল। আপনি সর্বাত্মক ধর্মঘট ডাকুন, গাড়িঘোড়ায় বাধা দিন, কাজে যেতে আটকান — অসুবিধা নেই। কিন্তু বন্ধ ডেকে যদি কাউকে না আটকান, কোনও সরকারি কর্মচারীকে বাধা না দেন, তবুও যেহেতু বন্ধ শব্দটা ব্যবহার করেছেন — অশুদ্ধ হয়ে গেল; অর্থাৎ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে গঙ্গাজলে শুদ্ধ করে নিয়ে হরতাল-ধর্মঘট বলতে হবে। এই যদি আইনি ব্যাখ্যা হয়, তবে তার পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে।

আমার আর একটা দিকও বলার আছে। গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর এই হস্তক্ষেপ, এ তো শুধু আমরা যারা এখানে আছি, তাদের সমস্যা নয়। বাইরের লাখো লাখো মানুষের সমস্যা। বন্ধ যদি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাতিয়ার হয়, তবে যাঁরা সেই মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁরা সকলে একযোগে, সর্বাত্মকভাবে দাবি তুলবেন না কেন? আপনারা জানেন, শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছিল, পার্লামেন্ট আইন করে তা বাতিল করে দেয়। এর ফলে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কোনও কার্যকারিতা থাকল না। শাহবানু মামলায় পার্লামেন্ট যদি এটা করতে পারে (কেউ এটা সমর্থন করতেও পারেন, নাও পারেন), তাহলে মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে অধিকার, তার ওপর যখন আদালতের খড়্গ নেমে এসেছে, তখন কেন গণআন্দোলন এই জায়গায় পৌঁছবেনা যে, ভারত সরকার আইন করে, নিদেনপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আইন করে মানুষের এই অধিকারকে রক্ষা করবে? এই দাবিও বোধহয় তোলার সময় এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ হলে বিরুদ্ধতা করব, আর অন্যান্য রাজ্যে নিজেরাই বন্ধ করব, সরকারি দলের এই দ্বিচারিতার প্রতিবাদ হওয়া দরকার।

তিনি বলেন, ন্যায় ও আইনের মধ্যে যদি কোনদিন দ্বন্দ্ব আসে, যে দ্বন্দ্ব আজ এসেছে, আপনাকে ঠিক করতে হবে, আপনি কোন্ দিকে। যদি আপনি ন্যায়ের পক্ষে হন, তবে বেআইনি হবে জেনেও আপনাকে ন্যায়ের পক্ষে থাকতে হবে। আর যদি শুকনো আইনের পক্ষে হন, তাহলে আপনার ন্যায়বিচারকে সমাধি দিয়ে আপনাকে বলতে হবে — আমি আইনের পাশে আছি। আমি জানি, এ প্রশ্ন যদি মানুষকে করা যায়, তবে যাঁদের অনেক আছে এবং হারাবার ভয় আছে, তাঁরা আইনের দিকে থাকবেন। আর যাঁদের হারাবার ভয় নেই, মানবিকতা আছে, তাঁরা ন্যায়ের দিকে থাকবেন। বন্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাতিয়ার কিনা, আজ এ নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। সর্বাধিক বিক্রিত সংবাদপত্রে লেখা হচ্ছে, এত পার্সেন্ট মানুষ বন্ধ চায় না, ছাত্ররা চায় না; এত পার্সেন্ট মানুষ বন্ধ চায়। কোথাও বলছে না, যারা বন্ধ চায় না, তারা কোন্ ইনকাম গ্রুপের লোক। বলছেনা, তাদের এই সার্ভেটা কাদের নিয়ে করা হল; তারা কি সাধারণ মানুষ, নাকি ধনী সম্প্রদায়ের লোক ? যে ছাত্রদের কথা সে বলছে, তারা কারা? তারা কি লা মার্টিনিয়ার, সেন্ট জেভিয়ার্স ইত্যাদি স্কুল-কলেজে পড়া, নাকি, সাধারণ পরিবারের ছাত্র? তাছাড়া আমার প্রশ্ন, বন্ধ যদি আন্দোলনের একটা হাতিয়ারই না হয়, তাহলে আইনি হস্তক্ষেপের প্রশ্ন আসছে কেন? গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলতে আমরা কী বুঝব? ন্যায়ের পক্ষে, মানুষের জীবনের অধিকারের পক্ষে শুধু জনমত সংগঠিত করাই গণতান্ত্রিক আন্দোলন নয়, জনমতকে সংহত করাও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ। ফলে যখন বন্ধের ডাক দেওয়া হয়, সেই বন্ধের আগেও আন্দোলনের নানা কার্যক্রম হতে পারে, পরেও হতে পারে, বা সরাসরি বন্ধেও চলে যাওয়া যেতে পারে। যেভাবেই বন্ধ হোক না কেন, বন্ধও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাতিয়ার। কারণ, এর দ্বারা জনমত সংহত হয়।

তিনি বলেন, অনেক সময়ই বন্ধে কত ক্ষতি হয়ে গেল, এই প্রশ্ন তোলা হয়। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর সারা দেশজুড়ে যখন বন্ধ ডাকা হল, তখন কি এ প্রশ্ন তোলা যায়, একটা ভারত বন্ধে কত টাকার ক্ষতি হয়ে গেল? মানুষে মানুষে সম্পর্ক নষ্ট করে দেওয়া হল, সেটা বড় কথা হল না, কত টাকার ক্ষতি হল, সেটা বড় কথা হল! সুতরাং ভেবে দেখতে হবে, কোনও আন্দোলন সাধারণ মানুষের স্বার্থে হচ্ছে, না কি বিরুদ্ধে হচ্ছে ; যদি সাধারণ মানুষের স্বার্থে হয়, তবে যাঁরা খবরের কাগজে ক্ষতির খতিয়ান দিচ্ছেন, তাঁদের জেনে রাখা দরকার, পৃথিবীতে কোথাও এমন কোনও আন্দোলন কোনদিনও হয়নি, যাতে কেউ ক্ষতি স্বীকার করেনি। মানুষের ত্যাগের মূল্যে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, মানুষের ত্যাগের মূল্যে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখি। কাগজগুলো যে সার্ভে করে, তা কতজনের মত নিয়ে করে? কী মূল্য আছে এই সার্ভেগুলোর ? গত লোকসভা নির্বাচনে তো কত রকমের সার্ভে হল, সবই তো জলে চলে গেল! মানুষের সাথে যাঁরা থাকেন, তাঁরা হচ্ছেন বিভিন্ন গণসংগঠন এবং রাজনৈতিক দল। মানুষ কী চায়, মানুষের কী প্রয়োজন, মানুষের কোন্ দাবিটাকে সামনে আনা দরকার — এটা তাঁদের চেয়ে বেশি কেউ বোঝে না। যাঁরা উচ্চ মঞ্চ থেকে বিচার করছেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, ''অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে/ সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছে সংকীর্ণ বাতায়নে/ মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে/ ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে/ জীবনে জীবন যোগ করা/ না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।'' যাঁরা ওপর থেকে দেখছেন, তাঁদের দেখাটা কৃত্রিম, বোঝাটা কৃত্রিম। যাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে রয়েছেন, জীবনে জীবন যোগ করেছেন, তাঁরা যেভাবে মানুষকে বুঝেছেন, সেই বোঝার যে অভিব্যক্তি দিয়েছেন — সেটাই সত্য। ''সেটা সত্য হোক,/ শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।''

মানুষের প্রয়োজনে যদি বন্ধ হয়, সে বন্ধ একশ' বার হবে। তা হবে ন্যায়ের বন্ধ। মানুষই তা সফল করবে।

হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অবনীমোহন সিনহা বলেন, আমাদের দেশের সংবিধানে রাইট অফ অ্যাসেম্বলি দেওয়া আছে। এর অর্থ আমরা সভা সমাবেশ করতে পারি। রাইট অফ অ্যাসোসিয়েশন দেওয়া আছে, যার অর্থ আমরা সংগঠন করতে পারি। এগুলো দেওয়া হয়েছে কেন? গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র মানে হচ্ছে, এখানে সরকার হচ্ছে of the people, by the people, for the people.

এখন কোন দল যদি সরকারে বসে জনগণের স্বার্থ না দেখে, যদি অন্যায় করে, তাহলে জনগণ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য, বিরুদ্ধ জনমতকে অবাধে প্রকাশ করার জন্য সভাসমাবেশ করতে পারে, মিছিল করতে পারে। এমনকী ধর্মঘটও করতে পারে। সংবিধানে কোথাও ধর্মঘট নিষিদ্ধ বলা নেই।

পরাধীন ভারতের একটা আইন ছিল। স্বাধীন হওয়ার পরও মহারাষ্ট্রে ছিল, যাতে বলা হয়েছিল, মিছিল, মিটিং করতে হলে পুলিশের অনুমতি লাগবে। ১৯৭৩ সালে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলায় প্রশ্ন তোলা হল — পুলিশের অনুমতি নেওয়ার এই বাধ্যতা কী আইনসম্মত? সুপ্রিম কোর্টের মেজরিটি রায়ে বলা হল, প্রশাসন মিছিল-মিটিংয়ে যুক্তিসম্মত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে, কিন্তু তা নিষেধ করতে পারে না, ''cannot prohibit'

আজ প্রতিবাদ, আন্দোলন নিয়ে যেসব আইনি প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, এগুলো ঠিক নয়। আইন মানুষের জন্য, আইনের জন্য মানুষ নয়। আইনের কাজ হল, সংবিধান অনুযায়ী ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। আজ শাসনব্যবস্থায় যারা আছে, তারা যদি কোনও অন্যায় করে, তাহলে আমি কী করব? পাঁচ বছর বসে থাকব পরের ভোটের জন্য? তখন আমি আমার প্রতিবাদ জানাব? তাও তো আবার এখন

সাতের পাতায় দেখুন

শিক্ষা ও ছাত্রস্বার্থে সংগ্রামের উজ্জ্বল ইতিহাস বহন করে

এ আই ডি এস ও ৫০ বর্ষ পূর্ণ করল

২৮শে ডিসেম্বর, ২০০৪, কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে এ আই ডি এস ও'র আহ্বানে সর্বভারতীয় ছাত্র সমাবেশ। ঠিক ৫০ বছর আগে ১৯৫৪ সালের এই দিনটিতেই এই শহরেরই একটি ছোট্ট হল ঘরে কয়েকজন কিশোরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা কনভেনশন। ছোট হল ঘরটিও সেদিন ভরেনি। কনভেনশনের উদ্যোক্তারা সকলেই পরিচয়হীন, প্রায় সকলেই স্কুল-কলেজের ছাত্র। তাদের প্রতিজ্ঞা, এদেশের বুকে গড়ে তুলবে একটি যথার্থ বিপ্লবী ছাত্র সংগঠন। তাদের লক্ষ্য, স্বাধীনতা পরবর্তী পুঁজিবাদী শাসনে আক্রান্ত সমাজ-সভ্যতা-শিক্ষাকে রক্ষা করা, শোষণের বিরুদ্ধে সমাজবিপ্লবের পরিপূরক ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা। তাদের হাতিয়ার, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। বিপ্লবী ঔদ্ধত্য নিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য সেদিন তাদের পথ চলা শুরু। তখন তারা সংখ্যায় হাতে গোনা কয়েকজন কিশোর। অন্যদিকে, কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদ, আর স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার ঐতিহ্যকে আত্মসাৎকারী বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক নাম নিয়ে বৃহৎ ছাত্র সংগঠন পি এস ইউ এবং এ আই এস এফ, যারা ভ্রান্ত আদর্শ নিয়ে পশ্চিমবাংলার ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। সেই অবস্থায় একজন ছাত্রকে ডি এস ও'র সাথে যুক্ত করা কত কঠিন কাজ ছিল তা আজ কল্পনাও করা যায় না।

সেদিন সাংগঠনিকভাবে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলি নেতৃত্বকারী স্থান দখল করে থাকলেও আদর্শগত প্রশ্নে এ আই ডি এস ও'র কাছে শুরু থেকেই বারবার তাদের নৈতিক পরাজয় ঘটেছে। শিক্ষার উপর যখনই কোন আক্রমণ নেমে এসেছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার ছাত্র সমাজ লক্ষ্য করেছে, সেদিন সাংগঠনিক শক্তিতে ক্ষুদ্র হলেও, আদর্শগত দিক থেকে ডি এস ও'র বক্তব্য ছিল স্বাতন্ত্র্য ও বলিষ্ঠতায় উজ্জ্বল।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকারের একটির পর একটি সর্বাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে সঠিক পথে শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার জরুরি প্রয়োজন থেকেই ১৯৫৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ডি এস ও'র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে কংগ্রেস সরকারের শিক্ষানীতি ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষানীতির পথ ধরেই চলছিল। সেই সময় 'গণদাবী'তে লেখা হয়েছিল — ''ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল, তার শোষণকে বজায় রাখার জন্য কতকগুলি কেরানী তৈরি করা। তাই সে গণশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেনি। ইংরেজের শোষণ যন্ত্রটিকে দখল করে ভারতীয় পুঁজিবাদী সরকার সেই একই পথ ধরে চলেছে। আজ আর সে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করতে চায়না, পাছে তারা স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরীর দাবী করে, আর চাকরী না পেয়ে তারা সরকারবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়। তাই শিক্ষার মান উন্নত করার নামে প্রতিবছর পরীক্ষায় পাশ করানোর হার কমিয়ে আনা হচ্ছে। শিক্ষার মান উন্নত করা এই পথে সম্ভব নয়, যতক্ষণ না গণশিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে।... আজ স্কুল, কলেজ বাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায়ও প্রতি কলেজে ছাত্রভর্তির সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে।'' (১৫-৮-১৯৫০)

এভাবেই স্বাধীনতার পর ক্ষমতায় বসেই কংগ্রেস সরকার জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থে শিক্ষাসংকোচনের পথে হাঁটতে শুরু করে, শিক্ষায় আসনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের স্কিম নিয়ে আসে। এর বিরুদ্ধে দেশজোড়া ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার কোন প্রয়াসই তখনকার বৃহৎ ছাত্র সংগঠনগুলি নেয়নি। এই অভাব থেকেই ছাত্রদের স্বার্থে ন্যায্য লড়াইয়ের সংগঠন রূপেই এ আই ডি এস ও'র প্রতিষ্ঠা হয়। আসনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা সংকোচনের বুর্জোয়া পরিকল্পনাকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয় ডি এস ও এবং আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এই আসনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও নতুন স্কুল-কলেজ না খোলার সরকারি ফরমানের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল তীব্র ভর্তি সংকট। এ আই ডি এস ও'ই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভর্তি সমস্যা সমাধানের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে। একই সাথে চলেছে যুক্ত বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস। ৬০-এর দশকের শুরুতে কলেজে ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে শুরু হয় যুক্ত ছাত্র আন্দোলন। ব্যাপক সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে সেই আন্দোলনে। যুক্ত ছাত্র আন্দোলনে এ আই ডি এস ও'র সাথে অন্যান্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির পার্থক্য ছাত্রদের কাছে সহজেই ধরা পড়ে। ছাত্রসমাজের মধ্যে ডি এস ও পরিচিতি লাভ করতে থাকে যথার্থ ছাত্র আন্দোলনের শক্তি হিসেবে। যুক্ত আন্দোলনের ফলে ১৯৬২ সালে সরকার ফি-বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। সেই সময়ই শুরু হয় মেডিকেল ছাত্রদের সমস্যা সমাধানের দাবিতে আন্দোলন। ডি এস ও এই দাবির সমর্থনে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। কংগ্রেসী জমানার পুলিশ তীব্র লাঠি চালায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল ছাত্র আন্দোলনে। তাতে আন্দোলনের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এখানেও এ আই ডি এস ও'র ভূমিকা ও তার সাংগঠনিক অগ্রগতি দেখে এবং পরিষদীয় রাজনীতিতে ফায়দা তুলতে তৎকালীন এ আই এস এফ (যার মধ্যে এস এফ আই-ও ছিল) নেতৃত্ব হঠাৎ মাঝপথে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়। ডি এস ও'র পক্ষ থেকে এ আই এস এফ-এর এই আপসকামিতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে 'মেডিকেল ছাত্র আন্দোলন — একটি পর্যালোচনা' নামে পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। ডি এস ও'র বক্তব্যে আকৃষ্ট হয় ছাত্রছাত্রীরা।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ঘোষণা করে অবৈজ্ঞানিক ও চূড়ান্ত জনবিরোধী হিন্দী ও মাতৃভাষার দ্বিভাষা নীতি। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয় সর্বভারতীয় স্তরে। ভাষাকে ভিত্তি করে তীব্র প্রাদেশিকতাবাদী মানসিকতাকে উস্কে দেওয়ার শাসকশ্রেণীর অভিসন্ধিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে এ আই ডি এস ও। এই সর্বনাশা ও ভ্রাতৃবিদ্বেষী ভাষানীতির প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তুলতে সুদূর কর্ণাটক ও মাদ্রাজে ছুটে যান ডি এস ও'র নেতৃত্ব।

ভর্তি সমস্যা, ফি-বৃদ্ধি বা ভাষানীতি — যে কোন প্রশ্নে ডি এস ও'র বক্তব্য শুধু ছাত্রদের নয়, আকৃষ্ট করে এদেশের বুদ্ধিজীবীদেরও। তাঁদের স্নেহ, ভালবাসা ও দরদবোধ ডি এস ও'র কর্মীদেরও প্রেরণা দেয়। শুধু শিক্ষা সমস্যা নয়, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, বাংলা-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন, গোয়া মুক্তি আন্দোলন বা ভিয়েতনামের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সংহতি — সমস্ত ক্ষেত্রেই এ আই ডি এস ও'র ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়েই এ আই ডি এস ও পশ্চিমবাংলার জেলায় জেলায় এবং অন্যান্য রাজ্যে সংগঠনের বিস্তার ঘটায়। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এবং দেশের প্রতিটি রাজ্যে এ আই ডি এস ও'র গড়ে ওঠার কাহিনী হল দুর্লঙ্ঘ বাধাকে অতিক্রম করার কাহিনী।

শিক্ষা ও সামাজিক আন্দোলনের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের মনীষী ও এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনচর্চা, দেশে দেশে মুক্তি আন্দোলনের কাহিনী জানার প্রচেষ্টায় সংগঠনের সূচনাপর্ব থেকেই নিয়োজিত এ আই ডি এস ও। শাসকশ্রেণী যখন ছাত্র-যুবকদের নৈতিক মেরুদণ্ড ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে একদিকে মনীষীদের জীবন সংগ্রামকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, নোংরা সিনেমার প্রসার ঘটাচ্ছে, ঢালাও মদ-জুয়া-সাট্টার কারবার ও মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলার চেষ্টা করছে, তখন এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক সর্বহারার মহান নেতা ও এদেশের মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে পাথেয় করে মনীষীদের স্মরণ অনুষ্ঠান এবং উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও রুচি-সংস্কৃতি গড়ে তোলার সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছে এ আই ডি এস ও।

পশ্চিমবাংলায় ১৯৭৭ সালে ক্ষমতাসীন হয় সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার। ক্ষমতায় এসেই কংগ্রেসের মতোই তাদেরও আক্রমণের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে শিক্ষা। প্রাথমিক স্তরে তারা ইংরেজি ও পাশফেল প্রথা তুলে দেয়, ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব কমিয়ে দেয়, শিক্ষার স্বাধিকার কেড়ে নেয়। তার বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও'র আন্দোলন ও আন্দোলনের জয়ের কথা আজ সকলেরই জানা।

দেশের শাসকশ্রেণীর স্বার্থে শিক্ষার উপর সর্বাত্মক আক্রমণ নামিয়ে আনার জন্য ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার প্রণয়ন করে 'জাতীয় শিক্ষানীতি' — যা শিক্ষার মর্মবস্তুকে ধ্বংস করার, শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ করার একটি সামগ্রিক 'নীল-নক্‌সা'। এর বিরুদ্ধেও রাজ্যে রাজ্যে এবং সারা দেশ জুড়ে তীব্র শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলে এ আই ডি এস ও। ডি এস ও'র উল্লেখযোগ্য ভূমিকার ফলেই দেশে গড়ে ওঠে 'সেভ এডুকেশন কমিটি', তৈরি হয় 'বিকল্প শিক্ষানীতি'। সারা দেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা সামিল হন এই আন্দোলনে।

পরবর্তীকালে জনতা দল বা বিজেপি জোট যারাই যখন কেন্দ্রের ক্ষমতায় এসেছে বা রাজ্যে রাজ্যে যখনই যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তারাই সেই সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতিকে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছে এ আই ডি এস ও। জয় অর্জিত হয়েছে বহু ক্ষেত্রে। ডি এস ও'র নেতৃত্বে বিহারের ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে একজন আন্দোলনকারীর শহীদের মৃত্যুবরণ ও শত শত ছাত্রের রক্ত ঝরানোর মধ্য দিয়ে আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে। পাঞ্জাবে অর্জিত হয়েছে ফি-বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের দাবি। আসাম, ওড়িশা পশ্চিমবাংলা সহ বহু রাজ্যে বহু ক্ষেত্রে বর্ধিত ফি কমাতে বাধ্য হয়েছে সরকার। জয় অর্জিত হয়েছে গুজরাটের বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে, ক্যাপিটেশন ফি'র বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও'র আন্দোলনে উত্তাল কর্ণাটক। ডি পি ই পি এবং সর্বশিক্ষা অভিযানের সর্বনাশা প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলনে উত্তাল কেরালা। সর্বত্রই শাসক দলের লেজুড় ছাত্র সংগঠনের গুণ্ডাবাহিনীর ও পুলিশ-প্রশাসনের আক্রমণ সত্ত্বেও এ আই ডি এস ও'র আন্দোলন অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। পশ্চিমবাংলায় ইংরেজি চালুর দাবি আদায় হওয়ার পর আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ জয় হল মেডিকেল শিক্ষায় ক্যাপিটেশন ফি'র বিরুদ্ধে।

সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যখন সেই পুরানো জাতীয় শিক্ষানীতি — যা বিজেপি জোট রূপায়িত করেছে, তাকেই নিয়ে চলছে, শিক্ষায় ক্যাপিটেশন ফি'র আক্রমণ আরো তীব্র আকার নিয়েছে, তখন উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির ছাত্রদের সংগঠিত করে এ আই ডি এস ও গত ২৪ সেপ্টেম্বর ১০ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে পার্লামেন্ট অভিযান করেছে এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন সিংকে ডেপুটেশন দিয়েছে। সারা দেশের সমস্ত আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়, সংগঠনের ৫০তম বর্ষের প্রতিষ্ঠা দিবসে এ আই ডি এস ও আহ্বান জানিয়েছে, ২৮শে ডিসেম্বর শহীদ মিনারে সর্বভারতীয় ছাত্র সমাবেশের। ২৭ থেকে ৩০ ডিসেম্বর এই উপলক্ষে কলেজ স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হবে এ আই ডি এস ও'র ৫০ বছরের সংগ্রামের চিত্র ও সংবাদ এবং মনীষীদের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী। ২৯ ডিসেম্বর সল্টলেক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এ আই ডি এস ও'র প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্যদের পুনর্মিলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংগঠনকে তিল তিল করে গড়ে তুলতে যাঁরা ঘাম-রক্ত ঝরিয়েছেন, তাঁরা শোনাবেন বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা।

সর্বভারতীয় ছাত্র সমাবেশ

২৮ ডিসেম্বর, ২০০৪, শহীদ মিনার ময়দান

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ, *উপদেষ্টা এ আই ডি এস ও, সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই*

অনলাইন লটারি ঃ বিধানসভায় এস ইউ সি আই-এর মুলতুবি প্রস্তাব

এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার গত ১৭ ডিসেম্বর বিধানসভায় নিম্নের মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন ঃ

''রাজ্যে অনলাইন লটারি নামক জুয়া খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা অত্যন্ত আতঙ্কজনকভাবে বেড়ে চলেছে। একদিকে রাজ্যের প্রধান শাসক দলের দলীয় মুখপত্র দিনের পর দিন বিজ্ঞাপন দিয়ে, অপরদিকে কলকাতা পুরসভা ট্যাক্স কমিয়ে দিয়ে যেভাবে এই জুয়ার ব্যবসাকে মহামারির মত ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে এবং হতাশায় আচ্ছন্ন দরিদ্র মানুষদের সামনে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে তা আরও উদ্বেগজনক। খেলতে গিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ সর্বস্ব হারাচ্ছে এবং অন্ধকার ভবিষ্যতের সামনে পথ না পেয়ে অনেকেই আত্মহত্যা করছে। ক্রমবর্ধমান এই ঘটনায় সমাজে প্রবল ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই ব্যবসা বন্ধ করার জন্য সর্বত্র মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। তাই অবিলম্বে এই সর্বনাশা অনলাইন লটারি ব্যবসা বন্ধ করা এবং বেকারদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি।''

অধ্যক্ষ মহাশয় প্রস্তাবটি শুধু পাঠ করার অনুমতি দেন।

ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক জয়

একের পাতার পর

কাজটাই আইন মেনে করেননি। আইনকানুন নিয়মনীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, আদালতকে প্রতারিত করে এবং জয়েন্ট পাশ করা সাধারণ মধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রাপ্য সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করে তাঁরা 'অনাবাসী কোটা'য় অর্থবানদের কাছে ডাক্তারি পড়ার সিটগুলি বেচে দিয়েছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টে তাঁরা জানিয়েছিলেন, অনাবাসী কোটায় যাদের নেওয়া হয়েছে তারা যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, ভাবখানা যেন, জয়েন্ট পাশ করা ছাত্রদেরই তাঁরা কোটায় ভর্তি করেছেন। অতএব দোষ কোথায়? আদালত প্রশ্ন তুলেছিল, (১) যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা একটাই হওয়া উচিত, এবং সেটা জয়েন্ট এন্ট্রান্স — সরকার সেই পরীক্ষার মেধা তালিকা থেকে ভর্তি করছে না কেন? (২) অনাবাসী কোটার প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্ব কেন এবং তাদের সংগে সরকারের গভীর আঁতাতের কারণই বা কী? (৩) সরকারি মেডিকেল কলেজে যদি টাকার জোরে ডাক্তার বানানো হয় তবে ডাক্তারি শিক্ষার হাল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? বলাবাহুল্য, সরকারপক্ষ কোন প্রশ্নেরই সদুত্তর দিতে পারেনি। তখন আদালত 'অনাবাসী কোটা'য় ভর্তির সরকারি প্রক্রিয়াকে 'বেআইনি ও অসাংবিধানিক' বলে আখ্যা দিয়ে এই কোটায় সমস্ত ভর্তি খারিজ করে দেয়। এর ফলে এন আর আই কোটায় ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীরা এক বছর নষ্ট হওয়ার মুখে পড়ে যায়। এই হল তাঁদের আইন মেনে চলার নমুনা ! এখন এদের হয়ে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার, সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই এবং কিছু সংবাদমাধ্যম যে অশ্রুপাত করছে তা নেহাতই মায়াকান্না। তারা বলছে, অনাবাসী কোটার এই ছাত্রছাত্রীরা যে বঞ্চিত হল, তাদের ভবিষ্যতের কী হবে? মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেয়েমেয়েদের বঞ্চিত করে সরকার যখন ডাক্তারি পড়ার সিটগুলি 'অনাবাসী কোটা'য় অর্থবানদের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকায় বেচে দিল, তখন কিন্তু এরা কেউ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই বঞ্চিত ছাত্রদের জন্য কান্নাকাটি বা হা-হুতাশ করেনি। আজ যখন সাধারণ ছাত্ররা লড়াই করে সরকারকে নতি স্বীকার করিয়ে নিজেদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করে নিল, তখনই এরা গেল গেল রব তুলছে এবং এমনভাবে প্রচার করছে, যেন অনাবাসী কোটায় ভর্তি ছাত্রছাত্রীদের বর্তমান দুর্দশার জন্য আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরাই দায়ী। এস এফ আই সেই মর্মে কলেজে কলেজে পোস্টার লাগিয়েছে, এবং দুই তরফের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ লাগানোর হীন চেষ্টা চালিয়েছে। এক্ষেত্রে সিপিএম নেতৃত্বের লক্ষ্য হল — তারা এদেশে শিক্ষায় ব্যবসায়ীকরণের কাজে বুর্জোয়া দলগুলিকে পিছনে ফেলে নিজেরা অগ্রদূত হতে চায়। অন্যদিকে যেসব সংবাদমাধ্যম যোগ্য ছাত্রদের ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করে 'অনাবাসী কোটা'র ছাত্রদের জন্য এখন চোখের জল ফেলছে, তাদের শ্রেণীস্বার্থ পরিষ্কার; মালিকশ্রেণীর স্বার্থের মুখপাত্র হিসাবে শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ সর্বক্ষেত্রেই বেসরকারীকরণ-ব্যবসায়ীকরণের পক্ষে ওকালতি করাই তাদের লক্ষ্য। ফলে কংগ্রেস-সিপিএম-বিজেপি'র সঙ্গে তারা যে এক সুরেই গাইবে — সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তবে একথা ঠিক যে, 'অনাবাসী কোটা'র ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি খারিজ হয়ে যাওয়ায় তারা সত্যিই বিপদে পড়েছে। কেননা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্যাপিটেশনের প্রস্তাবে প্রলুব্ধ হয়ে অন্যান্য জায়গা থেকে এখানে এসে তারা মেডিকেলে ভর্তি হয়েছিল লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে। এখন তাদের ভর্তি বাতিল হওয়ায় বিপদ হবেই। এর জন্য দায়ী কে? প্রথমত দায়ী রাজ্য সরকার; মেধা যাচাইয়ের স্বীকৃত পরীক্ষা এড়িয়ে জনগণের টাকায় তৈরি সরকারি কলেজ থেকে স্রেফ টাকা আর ক্ষমতার জোরে ডাক্তার হওয়ার এমন প্রলোভন সরকার না ছড়ালে, এই ছাত্রছাত্রীরা এখানে ছুটে আসত না। দ্বিতীয়ত, এই ছাত্রছাত্রীরা এখন হঠাৎ জানতে পারল যে, তাদের ভর্তি অবৈধ, বিষয়টি এমন নয়। প্রায় দেড় বছর আগে থেকেই এ বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদের বিষয়টি তারা জানতো। গত বছর (২০০৩) ১৭ আগস্ট তাদের জন্য সরকার যখন স্পেশাল এন্ট্রান্স পরীক্ষা গ্রহণ করে তখন তাদের পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনেই ডি এস ও'র নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা প্রবল বিক্ষোভ দেখায়; সেখানে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, গ্রেপ্তার করে। এ বিষয়টি তাদের অজানা ছিল না। এছাড়া প্রায়ই এ বিষয়ে বিক্ষোভ, মিছিল, অবস্থান, কনভেনশন, ধর্না, পথ অবরোধ হয়েছে। ঐ ২০০৩ সালে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যখন হাইকোর্টে গেল, তখন তারাও কোর্টে গিয়েছে। ২০০৪ সালে জুলাইয়ের শেষে 'অনাবাসী কোটা'য় সরকারি বাছাইয়ের ১০৫ জনের প্রত্যেককে আলাদাভাবে আদালতের 'আইনি চিঠি' দেওয়া হয়েছিল এবং তাতে অবৈধ 'অনাবাসী কোটা'য় ভর্তি না হওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু আগস্টে তারা ভর্তি হয়ে যায়। তারা হয়ত ভেবেছিল, সিপিএম সরকার তাদের ভর্তিকে বৈধ করে দেবে। সেদিন যদি তারা আন্দোলনকারীদের যুক্তিকে বিচারে নিত তবে আজ আর তাদের এই বিপদে পড়তে হত না। সিপিএম ফ্রন্ট সরকারও তাদের ভিত্তিহীন আশ্বাস দিয়ে দিয়ে প্রতিপদে বিভ্রান্ত করেছে, ফলে এখন তারা বিপদে পড়েছে, যার দায়িত্ব সরকারের।

ডাক্তারি ছাত্রদের আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির শ্রেণীগত অবস্থানও স্পষ্ট বেরিয়ে এসেছে। সিপিএম তো জয়েন্ট-উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে 'অনাবাসী কোটা'র পক্ষে লড়ছিলই। কলকাতা হাইকোর্টে 'অনাবাসী কোটা'র পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তৃণমূল এম পি আইনজীবী অজিত পাঁজা, সুপ্রিম কোর্টে সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের হয়ে 'অনাবাসী কোটা'র সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। অর্থাৎ অনাবাসী কোটার পক্ষে আছে বামফ্রন্ট সরকার, সিপিএম-কংগ্রেস-তৃণমূলের নেতারা, তাদের উচ্চমহলের সমস্ত যোগাযোগ, রাজ্যের সরকারি প্রশাসন এবং অনাবাসীদের অর্থবল; অন্যদিকে এই সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ছিল এস ইউ সি আই-এর ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও, চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং বঞ্চিত ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা। আইন ও ন্যায় দুইই ছিল তাদের পক্ষে। কার্যত ভিক্ষে করে চাঁদা তুলে তাঁরা প্রতিমুহূর্তের আন্দোলন পরিচালনা করেছেন, আবার ব্যয়বহুল হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে আইনি লড়াইও লড়েছেন। জনগণ পাশে থাকলে কোন আন্দোলনে কোনদিনই অর্থের অভাব হয় না। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী শাসকশ্রেণী কখনোই এই বিষয়টিকে বিবেচনায় রাখে না। এখানেই তারা দৃষ্টিক্ষীণতায় ভোগে।

এ রাজ্যে সিপিএম সরকার ভেবেছিল, সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পাশ ছাত্রছাত্রীরা মেধার তালিকায় স্থান পেলেও তারা অসংগঠিত; ফলে সরকার ও তার প্রশাসনের সংগঠিত শক্তির সঙ্গে লড়ার সাহস তারা পাবে না এবং আইনি লড়াই লড়বার মতো তাদের টাকার জোর, খুঁটির জোর কোনটাই নেই। বাস্তবও ছিল তাই। সরকারের আক্রমণের সামনে তারা কার্যত অসহায় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাদের সাহস জুগিয়ে সংগঠিত করে ছাত্র সংগঠন সারা ভারত ডি এস ও ; ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তাদেরকে সামিল করে। এই লড়াইতে নেতৃত্ব দিচ্ছে এস ইউ সি আই-এর ছাত্র সংগঠন — এটা ছিল আন্দোলনের আস্থা-বিশ্বাসের বনিয়াদ। কারণ, সুদীর্ঘকাল মানুষ প্রত্যক্ষ করছেন এই দলটিকে। ন্যায্য দাবি আদায়ে একমাত্র এস ইউ সি আই একের পর এক দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন গড়ে তুলছে, যার ফলশ্রুতিতে প্রাথমিকে ফিরে এসেছে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ, সরকারি ব্যবস্থার সমান্তরালে চলছে ৪র্থ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা, হাসপাতালের বর্ধিত চার্জ কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্ধিত ফি ও ডোনেশনের বোঝা অনেক ক্ষেত্রে কমানো গেছে, ডাক্তারি শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি অনেকটাই প্রত্যাহার করানো গেছে, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনে বহু সাফল্য অর্জিত হয়েছে, গ্রামীণ ক্ষেত্রে চাষীদের জমির উপর অন্যায়ভাবে খাজনা আরোপ আটকে দেওয়া গেছে, স্কুল স্তরে 'জীবনশৈলী' শিক্ষার নামে যৌনশিক্ষা প্রচলনের সরকারি প্রয়াস স্থগিত করা সম্ভব হয়েছে। এমনই বহু সফল আন্দোলনের ইতিহাস রচিত হয়েছে। এছাড়াও হয়েছে বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন। তাছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, পঞ্চায়েত কর প্রত্যাহার সহ নানান আন্দোলন চলছে। জনসাধারণ বুঝেছেন, এই দলটি এম এল এ, এম পির জন্য লালায়িত নয়, টাকার জোরে এদের কেনা যায় না। হুমকি, নেতা-কর্মীদের খুন, প্রলোভন — কোন কিছু দিয়েই এই দলটিকে সত্য পথ থেকে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াই থেকে বিচ্যুত করা যায় না।

তাই ডি এস ও'র ওপর তারা আস্থা স্থাপন করেছে, গড়ে উঠেছে আন্দোলনের হাতিয়ার 'জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্‌জামিনেশন (মেডিকেল) গার্ডিয়ান্স ফোরাম'। ফোরামের বর্তমান আন্দোলন বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম নয়। ফি-বৃদ্ধি বিরোধী দীর্ঘ আন্দোলনের ধারাতেই এই আন্দোলন গড়ে উঠেছে ও বিজয় অর্জন করেছে। এই জয় একদিনে অর্জিত হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে ধাপে ধাপে এগিয়ে ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে তবেই জয়লাভ সম্ভব হয়েছে। ২০০১ সালে যখন রাজ্য সরকার মেডিকেল সহ শিক্ষার সর্বস্তরে ফি-বৃদ্ধির নীতি ঘোষণা করে, তখনই তার বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে ডি এস ও। ২০০২ সালে সরকার ফি-বৃদ্ধি ঘটায়। মেডিকেলের ক্ষেত্রে টিউশন ফি বার্ষিক ২১৬ টাকার পরিবর্তে ১২০০০ টাকা, হোস্টেল চার্জ বার্ষিক ১৪৪ টাকার পরিবর্তে ৬০০০ টাকা এবং বিনামূল্যের রেজিস্ট্রেশনের পরিবর্তে ১০০০ টাকা ফি ঘোষণা করে। আরও ঘোষণা করে যে, প্রতি কলেজে ১৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হবে তাদেরই জন্য, যারা মাথাপিছু ১৮ লক্ষ টাকা দিতে পারবে। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এস ইউ সি আই এবং ছাত্র সংগঠন ডি এস ও'র নেতৃত্বে আন্দোলনও তুঙ্গে ওঠে। কনভেনশন, ধর্না, প্রতিবাদ মিছিল, বিক্ষোভ, পথ অবরোধ চলতেই থাকে।

২০০৩ সালের আগস্টে মেডিকেল ভর্তির মুখে এসে সরকার কিছুটা পিছু হটে। টিউশন ফি ১২ হাজারের পরিবর্তে ৯ হাজার টাকা করে এবং হস্টেলের বর্ধিত সকল চার্জ প্রত্যাহার করে নেয়। ১৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে ঘোষণা করে যে, প্রতি কলেজে ১০টি করে সীট সংরক্ষণ করা হবে। এই অবস্থায় জয়েন্ট-পাশ মেধা তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের নিয়ে গড়ে ওঠে সংঘবদ্ধ আন্দোলন। সরকার পিছু হটে এবং কলেজ পিছু আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিয়ে সব আসনেই জয়েন্ট-পাশ ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করে নেয়। কিন্তু জানিয়ে দেয় যে, কলকাতার এস এস কে এম এবং মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে যে নতুন ২০০ সীটের কলেজ হচ্ছে, তার মধ্যে ১৫০ আসন টাকার বিনিময়ে ভর্তির উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত করা হবে। তবে মাথাপিছু ১৮ লক্ষ টাকা নয়, ৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকার বিনিময়ে।

১৭ আগস্ট ঐ সংরক্ষিত ১৫০ সিটের জন্য একটি অবৈধ স্পেশাল এন্ট্রান্স পরীক্ষা নেয় সরকার। প্রতিবাদে ছাত্র-অভিভাবক বিক্ষোভ হয়। পুলিশ লাঠি চালায়, গ্রেপ্তার করে। তখনও কিন্তু কলেজ দু'টি ডাক্তারি পড়ানোর অনুমোদন পর্যন্ত পায়নি। ১৭ নভেম্বর ঐ ১৫০ জনকে সরকার 'কাউন্সেলিং'-এর জন্য ডেকে পাঠায়। তখন সেখান কাউন্সেলিং সার্কুলার পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। সরকার ১৬৫ জনকে বাছাই করে। ২৩ নভেম্বর আই এম এ হলে টাকার জোরে ডাক্তার বানাবার প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে নাগরিক কনভেনশন হয়। আবেদন-নিবেদন-বিক্ষোভ চালাতে চালাতেই বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীরা শেষপর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টে যায়।

২০০৪ সালের জুন মাসে দু'টি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন লাভ করে। সরকার ২৯ জুলাই পুনরায় কাউন্সেলিং মারফত অনাবাসী কোটায় ১০৫ জনকে নির্বাচন করে। তখন ঐ ১০৫ জনের প্রত্যেককে কোর্টের 'আইনি' চিঠি দিয়ে সরকারের অবৈধ প্রক্রিয়ায় সামিল না হওয়ার আবেদন করা হয়। আগস্টে কোটার তালিকা থেকে ৯৯ জন ভর্তি হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টে সরকার পরাস্ত হয়। তারা এবার সুপ্রিম কোর্টে যায়। এদিকে পুরো অক্টোবর মাস ধরে মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে তুমুল আন্দোলন চলে। ছাত্রদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ২৯ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তী আদেশে কোটার ৩০টি বাদে বাকী সব সিটে ভর্তিকে অবৈধ ঘোষণা করে সেই সিটগুলিতে জয়েন্ট পাশদের ভর্তির নির্দেশ দেয়।

২ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সিলেকশন কমিটির (মেডিকেল) চেয়ারম্যানের কাছে আদালতের রায় কার্যকর করার দাবিতে বিক্ষোভ চলে। ৪ নভেম্বর ছাত্র-অভিভাবকেরা ১২ ঘণ্টার অনশন ধর্মঘট চালায়। ১০ নভেম্বর মেডিকেল কলেজের ভাইস-চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করা হয়। ছাত্রদের উপর পুলিশ ও কো-অর্ডিনেশন কমিটি হামলা চালায়। সরকার আদালতের রায় মানছে না — এই অভিযোগে ছাত্ররা আবার সুপ্রিম কোর্টে যায়। ১৩ ডিসেম্বর কোর্ট সরকারকে কড়া ধমক দিয়ে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রায় কার্যকর করার নির্দেশ জারি করে। তখন রাজ্য সরকার অনন্যোপায় হয়ে ঐদিন রাতেই 'অনাবাসী কোটা'র ৬৯টি সিটে ভর্তি খারিজ ঘোষণা করে জয়েন্ট পাশ ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির নোটিশ জারি করে।

একদিকে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের দৃঢ় সংঘবদ্ধ আন্দোলন, এবং তারই ধারাবাহিকতায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত আইনি লড়াই — এই দ্বিমুখী চাপের সামনে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার আজ ন্যায্য দাবি মানতে বাধ্য হয়েছে। ছাত্র ও অভিভাবকদের সম্মিলিত আন্দোলনের এ এক ঐতিহাসিক জয়। চূড়ান্ত দাম্ভিকতার সঙ্গে সরকার যে অন্যায় ও অনৈতিক সিদ্ধান্ত ছাত্রছাত্রীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ভেবেছিল অসহায় ছাত্ররা সরকারের অন্যায় মানতে বাধ্য হবে, আজ সেই সিদ্ধান্তকেই তাদের লিখিতভাবে প্রত্যাহার করে নিতে হল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের উদ্দেশ্যে শাসকশ্রেণীর যে ছক, তাকে এ রাজ্যে কার্যকর করার মতলব সিপিএম সরকার পরিত্যাগ করেনি। তাকে কার্যকর করতে তারা ছলে বলে কৌশলে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই ছাত্র-অভিভাবকদের সংঘবদ্ধতায় এতটুকু শিথিলতা যেন না আসে — সে বিষয়ে সদাসতর্ক থাকতে হবে।

সেই সাথে আমরা আশা করব, আজ ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলনে, যে জনগণের সমর্থনে তারা বিজয়ী হয়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন, ডাক্তার হয়ে সেই জনগণ ও গণআন্দোলনের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা অটুট থাকবে। জনস্বাস্থ্যের দাবিতে তাদের সংগ্রামে, মেডিকেল এথিক্সের মর্যাদা রক্ষায় তাঁদের লড়াইয়ে এস ইউ সি আই সর্বদা রাজনৈতিক দল হিসাবে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করবে।

নাগরিক কনভেনশনের ঘোষণা

চারের পাতার পর

ভোট দিতেও দেয়না। এখন কী ভোটে জনমত প্রতিফলিত হয়? গুটিকয়েক সংবাদপত্রে যা বেরোবে, তাতেই হয়ে যাবে? গণতন্ত্র মানে জনমত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা। আমাকে তো তা প্রকাশ করতে দিতে হবে।

আমরা বরাবর জেনে এসেছি, একটা গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের ব্যবহার্য অত্যাবশ্যক পণ্যে ট্যাক্স বসানো যায় না, বরং প্রয়োজনে ভরতুকি দিতে হবে। অথচ, এখন পেট্রল-ডিজেল-গ্যাসের দাম সরকার ক্রমাগত বাড়াচ্ছে। ট্যাক্স, সেস বসিয়ে বাড়াচ্ছে। অন্য কোথাও সরকার কিছু করতে পারছে না, টাকা তুলছে পেট্রোপণ্যে কর বসিয়ে। জনগণকে শেষ করতে 'সেস্' বসাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদ করবে না? প্রতিবাদ হল বলেই তো মাসে মাসে গ্যাসের ৫টাকা দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বাতিল হল। সরকার ইচ্ছামতন দাম বাড়িয়ে যাবে, আমরা কিছু বলতে পারব না? তাহলে তো গণতন্ত্র থাকে না, হয় স্বৈরতন্ত্র। ফলে যারা প্রতিবাদ সংগঠিত করছেন, তাঁদের ধন্যবাদ দিতে হয়। তাঁরা মানুষকে চেতনা দিচ্ছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার। শেকল যাতে চেপে না বসে, তার জন্য শেকল ভাঙার গান তো গাইতেই হবে, রাস্তায় গিয়ে প্রতিবাদ করতে হবে। সরকার অন্যায় করলে আমরা সরকারকে অচল করে দেওয়ার চেষ্টা করবই। আমাদের সেই অধিকার আছে, অধিকার থাকবে। সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করে আদালত ভুল করছেন, বিচারপতিরা নিশ্চয়ই তা সংশোধন করবেন।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, এখানে গণআন্দোলনের উপর 'আইনি' হস্তক্ষেপের যে কথা বলা হয়েছে, আমার মনে হয় ওটা 'বেআইনি' হস্তক্ষেপ হবে। তাই কোর্টের ওই হস্তক্ষেপকে আমরা সমর্থন করতে পারিনা। আর একটি বিষয় হল, এখন যাঁরা সরকারে আছেন, তাদের স্থিতি দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তাঁরা কিছু বেআইনি কাজ করেন — যদিও তাঁরা সেগুলিকে বেআইনি বলতে রাজি হবেন না। এই যেমন একজন বিচারপতি, জমি বন্টনের বেলা তাঁকে বেআইনিভাবে দিয়ে দেওয়া হল, একজন পুলিশ অফিসার আইনানুগভাবে কাজ করে বদলি হয়ে গেল, আর শিক্ষাজগতে একজন কালাপাহাড়, তাকে সমাজের সবচেয়ে ওপরে স্থান দেওয়া হয়েছে, যাকে প্রয়োজন ছিল জেলে পুরে রাখা। অর্থাৎ সরকারে থেকে তারা যা করবে তাই আইনি, আর যারা সত্যিই কিছু করছে, যাদের পেছনে যুক্তি আছে, তা হয়ে গেল বেআইনি। এ জিনিস মেনে নেওয়া যায় না। আমি কনভেনশনের প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

বিশেষ প্রয়োজনে সুশীল মুখোপাধ্যায়কে চলে যেতে হওয়ায়, পরে সভা পরিচালনার দায়িত্ব নেন শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা তপন রায়চৌধুরী।

বিশিষ্ট বামপন্থী ব্যক্তিত্ব গৌতম সেন বলেন, আমরা বোধহয় একটা প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে বাস করছি। নাহলে আদালত এই সাহস পায় কী করে! কী করে সাহস পায় কেউ বলতে যে, বন্ধওয়ালাদের পেটাবে লোক। কেউ বলছেন, বন্ধ ব্যাধি। এসব কথা ষাট-সত্তর দশকে কেউ বলতে সাহস পেত বলে আমার মনে হয়না। আদালতকে খুব নিরপেক্ষ বলে আমার মনে হয় না, আদালত রাজনৈতিক আবহাওয়া অনুযায়ী চলাফেরা করে।

আদালত একটি অনির্বাচিত সংস্থা। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে ভারসাম্য রক্ষা করার যে ভূমিকাই আদালতের থাকুক, আদালতের এতসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোর অধিকার গণতন্ত্র দেয়নি। আমরা জানি যে, যেখানে শৃঙ্খলা অন্যায়কে ধারণ করে, সেখানে শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই ন্যায়ের সূচনা করে।

একটা কথা বন্ধ-বিরোধীদের পক্ষ থেকে খুব শোনা যাচ্ছে যে, বন্ধ হলে দিনমজুরদের ক্ষতি হয়, একজন মুমূর্ষু রোগী মিছিল হলে যেতে পারে না। দারুণ কথা! যে আদালত এত সংবেদনশীল, তারা কেন ভাবছে না যে, এমন একটি সমাজ এখানে তৈরি করা হল যেখানে একদিন কাজে না গেলেই সারা পরিবারকে না খেয়ে মরতে হয় ! আদালতের কর্তাদের তো এমন অবস্থা হয় না, মন্ত্রীদের তো এমন অবস্থা হয় না! তাহলে এরকম সমাজে লোক বাস করবে কেন, যেখানে একদিন কাজ না করলে তারা খেতে পাবে না, তা আদালত তো কোনদিন সুয়োমোটো কেস্ করে না যে, কাউকে হাসপাতাল থেকে ফেরত দেওয়া যাবে না, কেউ অনাহারে মারা গেলে সরকার দায়ী থাকবে! আদালত তো এই রায় দিচ্ছেনা!

সরকারি দলগুলির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, বন্ধ হচ্ছে শেষ অস্ত্র। তা তাঁরা কি প্রথম অস্ত্র, দ্বিতীয় অস্ত্র কোনও অস্ত্রই প্রয়োগ করছেন? হঠাৎ 'শেষ অস্ত্র' 'শেষ অস্ত্র' বলে এত সোরগোল কেন?

বিশিষ্ট বামপন্থী জননেতা মানিক মুখার্জী বলেন, বেশিরভাগ বক্তাই বলেছেন, মানুষ ন্যায়ের পক্ষে থাকবে; আইন যদি কখনো ন্যায়ের বিরুদ্ধে যায়, সে আইনকে পরিবর্তন করাটাই হল সত্যিকারের মনুষ্যত্বের পরিচয়। আমরা জানি, সমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় আইন একটা সময়ে এসেছে। মানুষের সার্বিক বিকাশের ও প্রগতির ধারাবাহিকতায় কোনও বিশেষ আইন যখন বাধা হয়েছে, তখন মানুষই তা পাল্টেছে। এক সময়ে রাজতন্ত্রের আইন যখন প্রগতির রাস্তা অবরুদ্ধ করছিল, মানুষ তাকে ভেঙেছে, পাল্টেছে। আমরা জানি, প্যাপাল কোর্ট — তার বিরুদ্ধে ইউরোপে আন্দোলন হয়েছে, তার পরিবর্তন হয়েছে। এসেছে রেনেশাঁস, গণতান্ত্রিক বিপ্লব, শিল্পবিপ্লব। এই সময় জুরিসপ্রুডেন্স, আইন — এগুলো তৈরি হয়েছে। সেই সময়ই একটা কথা এসেছে যে, আইন মানুষের জন্য এবং আইনের সাথে যখন ন্যায়ের সংঘাত বাধবে, তখন ন্যায়ের ঝাণ্ডাই মানুষ বহন করবে। সমাজ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। পরিবর্তনের পথ বেয়ে সমাজ এগিয়ে চলেছে। এটাই মানুষেরও সংগ্রাম — উন্নত থেকে আরও উন্নত। একটা বিশেষ ব্যবস্থার আইন, যখন উন্নততর সমাজের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই আইনকে ভাঙাটাই হল যথার্থ ন্যায় — এই কথাটা মনে রাখতে হবে। এ যুগের একজন বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ, আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, আইনের দর্শন ও এথিক্স-এর একটা বড় কথা হল, যেটা আইনসম্মত, সেটা সব সময় ন্যায়সঙ্গত নাও হতে পারে। তাহলে আইন এবং ন্যায়ের এই বিরোধের মধ্যে মানুষ কোন্ পক্ষ নেবে? অবশ্যই ন্যায়ের পক্ষ নেবে — সমাজের প্রগতির জন্য।

কোর্টের রায় যখন জনস্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তখন এভাবে চিন্তা করাটা ঠিক নয় যে, বিচারপতিরাও ভুল করতে পারেন। এটা নিছকই একজন ব্যক্তির ভুল না। বিচারপতি বা বিচারব্যবস্থা রাজনীতির ঊর্ধ্বে নয়, এটা শ্রেণীস্বার্থকেই রক্ষা করে। পুঁজিপতিশ্রেণীকে রক্ষা করার জন্যই রাষ্ট্র, পুলিশ, মিলিটারি, ব্যুরোক্রেসি, আইনশাস্ত্র সবকিছুর সৃষ্টি। ফলে, ভুল-ঠিকের ব্যাপার এটা নয়। এটা হল, গণআন্দোলন — যে গণআন্দোলনের মধ্যে এই শোষণের অবলুপ্তির সম্ভাবনার বীজ লুক্কায়িত আছে, তার উপর আঘাত। এই আঘাত পুলিশ দিয়ে হয়, প্রশাসন দিয়ে হয়, পুঁজিবাদের রক্ষক রাজনৈতিক দলগুলো করে। তারপরে আছে জুডিশিয়ারি — যারা আপাতদৃষ্টিতে নিরপেক্ষ, যাকে ন্যায়ের আলয় — ন্যায়ালয় বলা হয়। যে বুর্জোয়াশ্রেণী আইনের শাসনের কথা বলে, তাদের হাতে আইন ও বিচার বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বাজারের পণ্যে পরিণত হয়ে গেছে — যেটা সেসময় গল্‌সওয়ার্দির মতো নাট্যকার বলিষ্ঠভাবে বললেন, ''Justice is sold and bought by the highest bidder.''

আজকে যে বিপদটা আসছে,তা আসলে সত্যিকারের গণআন্দোলন — যা গণমুক্তির রাস্তাকে প্রশস্ত করবে, সেই আন্দোলনের ওপর একটি শ্রেণী-আঘাত। রাষ্ট্র, পুলিশ-প্রশাসনের পর এবার আইনরক্ষার নামে আঘাত এল, বিচারকরাও এরকম একটা রায় দিলেন। এ ঘটনা এমনি এমনি হচ্ছে না। এই কথাটাকে মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, আন্দোলনের অধিকার রক্ষা করার জন্য একটা আন্দোলন গড়ে তোলা — এই উদ্দেশ্যে সি পি ডি আর এস-কে কর্মসূচি নিতে হবে।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক গীতেশ শর্মা ও সুফি সমাজের সভাপতি মোবারক করিম জহর।

কনভেনশনে পেশ করা প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে এম এস এস নেত্রীবৃন্দের সাক্ষাৎ

গত ৮ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জীর নেতৃত্বে চার জনের প্রতিনিধি দল দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন — দিল্লি রাজ্য কমিটির সভানেত্রী কমরেড সুবোধ শর্মা, অল ইন্ডিয়া কমিটির সদস্য কমরেড কুসুম সিং ও অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল সদস্য কমরেড রচনা অগ্রবাল।

স্মারকলিপির বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করে কমরেড ছায়া মুখার্জী নারীদের উপর ক্রমবর্ধমান অপরাধের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীকে বলেন — কেবল অধঃপতিত বা পাকা অপরাধীরাই নয়, সরকারি উর্দিধারী আইনের রক্ষকদের হাতে, এমনকী তাদের হেফাজতে মহিলারা আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। এ কথার জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন — ''আমি আপনার সঙ্গে একমত''। নারীদের উপর আক্রমণ, বিশেষত সরকারি উর্দিধারীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কমরেড ছায়া মুখার্জী প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। সাথে সাথে, গণমাধ্যমে এবং বিজ্ঞাপনে অশ্লীল ও নগ্ন ছবির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন — এর ফলে সবধরনের অপরাধ এবং বিশেষ করে নারীদের উপর অপরাধ বাড়ছে। এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমাজ-মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন — মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন গোটা দেশে সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনা করছে, কিন্তু সাথে সাথে সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

রাত্রে কোন অবস্থাতেই মহিলাদের গ্রেপ্তার করা যাবে না এবং দিনে গ্রেপ্তার করার সময় মহিলা পুলিশের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক — এই মর্মে ১৯৯৩ সালে মুম্বই হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিল, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট তা খারিজ করে দিনে রাতে যে কোন সময় মহিলা পুলিশ ছাড়াই মহিলাদের গ্রেপ্তার করার যে অধিকার প্রশাসনকে দিয়েছে তা খুবই বিপজ্জনক বলে কমরেড ছায়া মুখার্জী প্রধানমন্ত্রীকে জানান। প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে সুবিবেচনার আশ্বাস দেন।

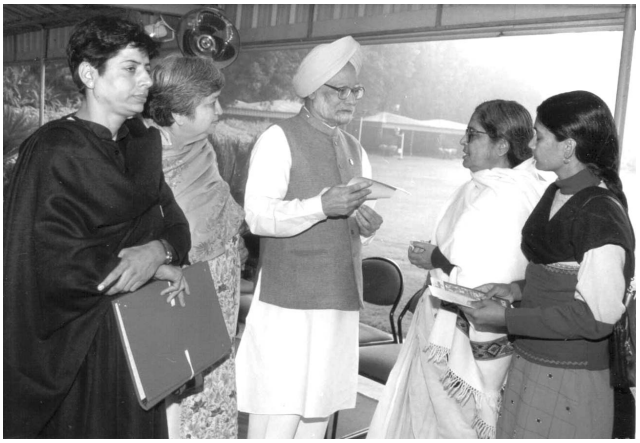

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর সঙ্গে কথা বলছেন কমরেড ছায়া মুখার্জী ও অন্যান্যরা

বন্‌ধ নিয়ে শুনানি

একের পাতার পর

হরতাল সমাজে থাকা দরকার, গণতন্ত্রে এগুলো থাকবেই। এগুলো কেড়ে নেওয়া হলে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র থাকে না, স্বৈরতন্ত্র এসে যায়। তাঁরা আরও বলেন, ধর্মঘট-হরতালের অধিকার না থাকলে সমাজে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ক্রোধ বেরোবার পথ না পেয়ে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেবে, বিস্ফোরণ ঘটবে। আদালত তা চায় না। তবে সুপ্রিম কোর্ট বন্‌ধকে বেআইনি ও অসাংবিধানিক বলেছে, হরতাল-ধর্মঘটের সাথে বন্‌ধের পার্থক্য করেছে।

সুপ্রিম কোর্ট মনে করেছে, বন্‌ধ মানেই জবরদস্তি, অন্যের মৌলিক অধিকারগুলিতে হস্তক্ষেপ, বন্‌ধ মানেই ভয়ভীতির পরিবেশ। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দ্বারা এই আদালত বাঁধা।

প্রভাস ঘোষ বলেন, ''এই পার্থক্যের বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমরা কোনও বন্‌ধেই জবরদস্তি করিনা, এবারও করিনি। আমরা জনগণের কাছে আবেদন করেছিলাম, তারা স্বেচ্ছায় সাড়া দিয়েছেন।''

এরপর ভবেশ গাঙ্গুলি বলেন, প্রভাস ঘোষ লিখিত বক্তব্য এনেছেন, তিনি সেটি জমা দিতে চান। বিচারপতিরা অনুমতি দেওয়ায় আদালত সেই লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করে।

পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায়।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

শ্রীরামপুর গার্লস কলেজে ডি এস ও'র বিপুল জয়

হুগলি জেলার শ্রীরামপুর গার্লস কলেজে এ আই ডি এস ও পরিচালিত ফি-বৃদ্ধি বিরোধী ছাত্রী কমিটি ছাত্রী সংসদ নির্বাচনে ২২টি আসনের প্রতিটিতে জিতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। গত ১৬ অক্টোবর প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ১৪টি আসনে নির্বাচন হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের নির্বাচনে নজিরবিহীন সন্ত্রাস সৃষ্টি করেও বিপুল ভোটের ব্যবধানে হেরে যাওয়ায় এস এফ আই তৃতীয় বর্ষের নির্বাচনে আর প্রার্থী দেওয়ার মনোবল পায়নি। সেই সময়ে পার্ট ওয়ান পরীক্ষার ফল ঘোষণার জন্য স্থগিত রাখা তৃতীয় বর্ষের নির্বাচনে গত ১৬ ডিসেম্বর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে ছাত্রী কমিটির প্রার্থীরা।

প্রথম দফায় ১৩টি আসনে ছাত্রী কমিটির বিরুদ্ধে প্রার্থী দেয় এসএফআই। কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে কোন জায়গা করতে না পেরে এসএফআই-এর বহিরাগত ছেলেরা সিপিএম পার্টি মেশিনারি সহ এই গার্লস কলেজে বার বার হামলা চালায়। প্রত্যন্ত এলাকাতেও ছাত্রীদের বাড়ি গিয়ে ভীতি প্রদর্শন করে। ১৬ অক্টোবর নির্বাচনের দিন গোটা শ্রীরামপুর জুড়ে এসএফআই, সিপিএম এবং সিটুর লোকজন সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে থাকে। ভোট দিতে আসা ছাত্রীদের বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মোড়ে এবং স্টেশনে ভয় দেখাতে থাকে, কলেজে গণ্ডগোল চলছে বলে গুজব ছড়ায়। এত কিছু সত্ত্বেও অভিভাবকেরা ছাত্রীদের কলেজে পাঠান ছাত্রী কমিটির প্রার্থীদের ভোট দিতে। কলেজে ঢোকার মুখে ছাত্রীরা ছাত্রী কমিটির প্রার্থীদের রোল নম্বর হাতে লিখে নিয়ে গেলে ঐ বহিরাগত এসএফআই ও সিপিএমের লোকেরা মেয়েদের হাত ধরে তা মুছে দিয়ে এসএফআই-এর প্রার্থীদের নাম লিখে দিতে থাকে। তখন ছাত্রীরা ঘড়ির ব্যান্ডের তলায়, জামার ভিতরে রোল নম্বর লিখে নিয়ে গিয়ে এসএফআই-এর বিরুদ্ধে ভোট দেয়। ভোট দিয়েই ছাত্রীদের কলেজ ছেড়ে চলে যাওয়ার নোটিশ সত্ত্বেও মেয়েরা গণনা পর্যন্ত ব্যালট বাক্স পাহারা দিতে ভীড় করে কলেজের ছাত্রী কমিটির প্রার্থীদের সাথে থেকে যায়। সন্ধ্যা ৭টায় গণনা শেষ হতেই এসএফআই ও সিপিএমের প্রচুর লোক ছাত্রীদের উপর লাঠি, হকিস্টিক নিয়ে চড়াও হয়। চলতে থাকে অশ্রাব্য গালিগালাজ। কলেজের মাননীয়া অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মীরা তখন ছাত্রীদের পাশে এসে দাঁড়ান। বিশেষ পুলিশ পাহারায় ছাত্রীদের ট্রেনে, বাসে তুলে দেন, নিজেরা গাড়ি করেও অনেক ছাত্রীকে পৌঁছে দেন। সিপিএম, সিটু, এসএফআই-এর আশ্রিত সমাজবিরোধীদের এই ভয়াবহ হামলায় কলেজ নির্বাচনের ফলাফল সেদিন ঘোষণা করা যায়নি। লিখিতভাবে সেই ফলাফল জানানো হয় দুই মাস পরে এই তৃতীয় বর্ষের নির্বাচনের সময়।

এ আই ডি এস ও পরিচালিত ছাত্রী কমিটির এই জয় কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। দীর্ঘ দুই বছর ধরে এই কলেজে ছাত্রীদের প্রতিটি বিষয় নিয়ে, কর্তৃপক্ষের যেকোন রকমের ফি-বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, মেয়েদের উপর বহিরাগত এসএফআই-এর হামলার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। আন্দোলনের ফলে বর্ধিত ফি প্রত্যাহৃত হয়েছে। ছাত্রী কমিটি পরিচালিত বিগত ছাত্রী সংসদকে কর্তৃপক্ষ নবীনবরণ, সোস্যাল বা ইউনিয়নের নির্দিষ্ট কাজে টাকা দেয় নি। ছাত্রী কমিটি ছাত্রীদের সংগঠিত করে চাঁদা তুলে ইউনিয়নের কাজ চালিয়েছে। ছাত্রীদের এই সংগঠিত শক্তিরই জয় হল ছাত্রী সংসদ নির্বাচনে।

ট্রেনযাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে

— নীহার মুখার্জী

১৪ ডিসেম্বর সকালে পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুরের নিকট মুঞ্চেরিয়ানে আমেদাবাদ জম্মু-তাওয়াই একস্‌প্রেস ট্রেনের সঙ্গে পাঠানকোট-জলন্ধর ডি এম ইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে সরকারি হিসাবে ৫০ জন ট্রেনযাত্রী নিহত ও ১৫০ জন গুরুতর আহত হয়েছে। বাস্তবে এই সংখ্যা আরও অনেক। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১৪ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে গভীর শোক ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং রেলকর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এই ভয়াবহ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের ন্যূনতম নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ব্যর্থ। পূর্বতন বিজেপি নেতৃত্বে এন ডি এ সরকারের মতই কংগ্রেস নেতৃত্বে বর্তমান ইউ পি এ সরকার যখন উচ্চস্বরে দাবি করছে তারা রেলযাত্রী পরিবহনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও উন্নত করছে এবং সেই অজুহাতে ট্রেনযাত্রীদের ওপর অতিরিক্ত সেসও বসাচ্ছে তখন বাস্তবে একের পর এক ট্রেন দুর্ঘটনাই প্রমাণ করছে এখনও পর্যন্ত নিরাপত্তার কার্যকরী কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি।

এই ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত ও আহতদের পরিবারগুলিকে কমরেড মুখার্জী গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি জানানোর সাথে সাথে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে এই পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি করেন। তিনি আরও দাবি করেন যে, রেল যাত্রীদের পূর্ণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রেল কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে।

জয়নগরে গণবিক্ষোভে অনলাইন লটারি বন্ধ হল

বহু সংগ্রাম ও সংস্কৃতির পীঠস্থান জয়নগর-মজিলপুরে স্বার্থান্বেষী চক্র সরকারি মদতে অনলাইন লটারির কয়েকটি দোকান চালু করে। এই লটারি চালু হওয়ার সাথে সাথেই ডি ওয়াই ও, ডি এস ও, এম এস এস-এর পক্ষ থেকে ৯ ডিসেম্বর জয়নগরে একটি অনলাইন লটারির দোকান বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১২ ডিসেম্বর জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভার বিশিষ্ট নাগরিক, মা-বোন, যুবক সহ দু'শতাধিক মানুষ শান্তি সংঘের সামনে থেকে মিছিল করে মিত্রগঞ্জের বাজারে অনলাইন লটারির দোকানে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় সেটি বন্ধ করতে বাধ্য হয়। বহু সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়ে মিছিলকারীদের সাথে রাস্তা ও দোকান অবরোধ করে। দত্ত বাজারের দোকানটিও বন্ধ হয়ে যায়।

হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীদের মিছিল, আইন-অমান্য

ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউট, ক্লোজার ও চটশিল্পে উৎপাদন ভিত্তিক বেতন-এর কালাচুক্তির প্রতিবাদে এবং আদালতের রায়কে হাতিয়ার করে ধর্মঘটের অধিকার হরণের চক্রান্ত রুখতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর আহ্বানে ১৭ ডিসেম্বর কলকাতায় ৫ সহস্রাধিক শ্রমিকের সমাবেশ ও আইন অমান্য হয়।

এদিন বেলা ১২টায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে মালদা ও দুই দিনাজপুর জেলা বাদে পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেলা থেকে আগত বিরাট শ্রমিক সমাবেশে সংগঠনের অন্যতম সহ-সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য চটকলে উৎপাদনভিত্তিক বেতনের কালাচুক্তির তীব্র প্রতিবাদে সামিল আগত শ্রমিকদের অভিনন্দন জানান ও প্রতিটি কারখানায় ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলবার আহ্বান জানান। অন্যতম সহ-সম্পাদক কমরেড ডি কে মুখার্জী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে বলেন, বিড়ি শিল্প সহ ৫৪টি শিল্পে শ্রমিকরা সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির অর্ধেকে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই ভয়াবহ অবস্থার মোকাবিলায় প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন। কমরেড দীপক দেবও বক্তব্য রাখেন। এরপর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শ্রমিকদের সুসজ্জিত মিছিল এগিয়ে যায় রানি রাসমণি রোডের পথে। অসংখ্য মানুষ গভীর আশায় এই দৃপ্ত মিছিল প্রত্যক্ষ করেন। রানি রাসমণি রোডে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহার নেতৃত্বে ১৩৮৭ জন শ্রমিক আইন অমান্য করেন।

সিপিএম নেতা কর্তৃক নারী পাচারের প্রতিবাদে এম এস এস-এর বিক্ষোভ

কলকাতার তালতলা এলাকার সিপিএম লোকাল কমিটির এক সদস্য সিপিএম দলের এক মহিলা কর্মীকে জম্মু-কাশ্মীরে নারীপাচারকারীদের কাছে বিক্রি করে দেয়। দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতেও এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই নারী পাচারকারীকে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১৩ ডিসেম্বর তালতলা থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং থানার ওসির কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, পশ্চিমবাংলায় সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের ২৭ বছরের রাজত্বে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, বধূহত্যা, ইভটিজিং, নারীপাচার ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে। শাসকদল সিপিএম-এর নেতাকর্মীরা অনেকেই এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। সিপিএম ফ্রন্ট সরকার এই অপরাধ প্রবণতা দমনের জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা তো নিচ্ছেই না, উল্টে ঢালাও মদের দোকানের লাইসেন্স, অনলাইন লটারি, অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতির জোয়ার সৃষ্টি করে এই ধরনের অপরাধ প্রবণতাকে বাড়তে সাহায্য করছে। এর বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষ আন্দোলনে না নামলে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিকে রোধ করা যাবে না।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net